শাহরিয়ার কবির

নীলিয়াছড়ির সোনার খনি

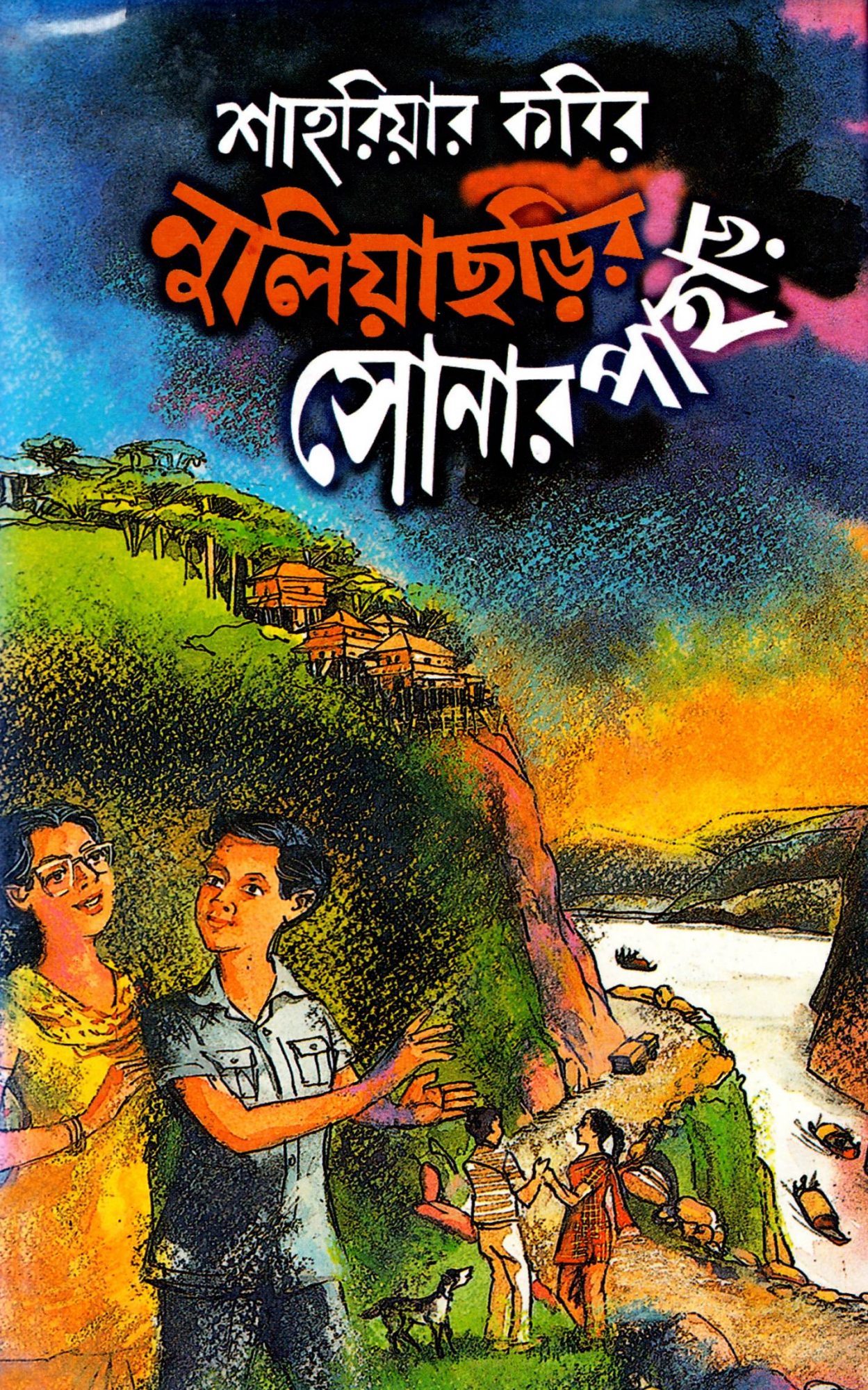

নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়

প্রকাশকের নিবেদন

.....

বলা বাহুল্য শাহরিয়ার কবিরের লেখা কিশোর উপন্যাসগুলোর মধ্যে নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল দ্বিতীয় সংস্করণ সাদা কাগজে বের করলে দাম পড়ছে বেশি, কারণ ততদিনে কাগজ ও ছাপার খরচ বেড়ে গেছে অনেক। এসব ভেবে, যারা স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বই কেনে তাদের কথা সামনে রেখে বইটির পেপারব্যাক সংস্করণ বের করা হয় তখন। কিন্তু নিউজপ্রিন্টে বইটি পাঠক গ্রহণ করলেন না দাম কম হওয়া সত্ত্বেও। তাই আবার সাদা কাগজে শোভন সংস্করণই বের করা হল। আশা করি পাঠক এবার খুশি হবেন।

তবে পেপারব্যাক সংস্করণ বের করার সময় বইটিকে বাড়িয়েছিলেন লেখক। লেখকের কথায় "নতুন করে পড়তে গিয়ে মনে হলো অপু চরিত্রটির ওপর সুবিচার করা হয় নি। এবার তাই নতুন একটি অধ্যায় যোগ করে দিলাম, যাতে অপুকে চেনা যায়। মাঝে মাঝে আরো যোগ করেছি, কিছু বাদও দিয়েছি। বলাই বাহুল্য, আরো ভালো করার জন্যই এসব করা। যাদের জন্যে করা তাদের ভালো লাগলেই বাঁচি। আবির বাবু, লিলি টুনিকে নিয়ে আগেই বলেছিলাম আরো লিখবো। এবার ভাবছি ঠিক ঠিক লিখে ফেলবো। যদিও সত্যিকার আবিররা অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু গল্পের ওরা এখনো আগের মতোই আছে।"

এবার সেই বর্ধিত সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ করা।

নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়

শাহরিয়ার কবির

প্রতীক

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৬
তৃতীয় সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯০
চতুর্থ সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৫
প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০ থেকে এফ. রহমান
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড,
সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : হাশেম খান

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র।

'NULIACHARIR SONAR PAHAR' by Shahriar Kabir Price Taka 50.00
বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা

উৎসর্গ

বাবা ও বাবলুকে

নেলী খালার জলপাই-সবুজ চিঠি

সূর্যটা এখন ঠিক মাথার ওপরে। আমাদের রূপলাল লেনের পুরোনো বাড়িটার বিশাল ছাদের কোথাও একরত্তি ছায়া নেই। গোটা ছাদ জুড়ে ঝাঁঝা রোদ। পাশের বাড়ির চৌধুরীদের কামরাঙ্গা গাছের ডালে কয়েকটা পাতিকাক মাঝে মাঝে অলস গলায় ডাকছে। খুব একটা বাতাসও নেই। গোটা আকাশটা জুন মাসের গনগনে রোদে ঝলসে যাচ্ছে।

বাবু আর আমি চিলেকোঠায় বসেছিলাম। আট দিন আগে বাবু আমেরিকা থেকে এসেছে। ওখানে মিসৌরীর এক স্কুলে পড়ে। ওর বাবা, অর্থাৎ আমার মেজকাকা ওয়াশিংটনে আমাদের এ্যাম্বেসিতে কাজ করেন। বলতে গেলে আমি এক রকম জোর করেই বাবাকে দিয়ে মেজকাকাকে চিঠি লিখিয়ে বাবুকে এনেছি। নইলে গরমের লম্বা ছুটিটা একা আমার কী করে যে কাটতো ভেবে পাই না।

আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। ক'দিন আগে আমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আগের মতো আমি ফার্স্ট হয়েছি। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আমার মিশতে ইচ্ছে করে না। ক্লাসে ফার্স্ট হই বলে সবাই আমাকে হিংসে করে। আড়ালে বলে, আমার নাকি দেমাগে মাটিতে পা পড়ে না। আমি তো কাউকে ফার্স্ট হতে বারণ করি নি। রকিবুল ফি বছর ওদের বাড়িতে স্যারদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। ওর বাবা মস্ত বড়ো ব্যবসায়ী। প্রায়ই বিদেশে ঘোরেন। আর রকিবুল স্যারদের কলম, রুমাল এসব প্রেজেন্ট করে। ওর বাবা নাকি সিঙ্গাপুর না হংকং থেকে ওসব আনেন। তবু রকিবুল সেকেন্ডের ওপরে উঠতে পারে নি। সারা ক্লাসে ও আমার নামে বাজে কথা বলে বেড়ায়। ক্লাসের ছেলেরাও ওর নামে অজ্ঞান। তাই বাবু ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই।

দু'বছর আগে বাবু আমেরিকা গিয়েছিলো। তখন ও দেখতে ছিলো অসম্ভব ফর্সা আর রোগা। এখন ও আগের চেয়ে অনেক লম্বা—শরীরটাও ভালো হয়ে গেছে। ফর্সা রঙটা এখন আর ফ্যাকাশে মনে হয় না। নীল জিনসের ট্রাউজার আর সেইন্ট-এর ছাপঅলা গেঞ্জি পরা বাবুকে আমেরিকান ছবির কাউবয়দের মতো মনে হয়। তবে এখনো আমার সঙ্গে পাঞ্জায় হেরে যায়।

গত আট দিন আমরা সারা দিন সারা রাত শুধু কথা বলেছি। আমাদের যতো কথা ছিলো, এ ক'দিনে সব বলা হয়ে গেছে। বাবু এখন চিলেকোঠার খাটে বসে 'এ্যাডভেঞ্চার অব হাকলবেরী ফিন' পড়ছে। আর আমি বাবার পুরোনো ইজি চেয়ারে শুয়ে ভাবছিলাম হাক ফিনের জীবনটা কী মজা করেই না কেটেছে! ওর মতো যদি বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে বেশ হতো। একটা ছোট্ট নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যেতাম। আর এমন একটা নির্জন দ্বীপ আবিষ্কার করে ফেলতাম, যেখানে মড়ার খুলি আঁকা গাছের নিচে আগেকার দিনের হার্মাদদের লুকিয়ে রাখা দারুণ সব গুপ্তধন রয়েছে। কিন্তু একা কী করে যাই! হাক ফিন একা এ্যাডভেঞ্চার করে নি। কখনো ওর সঙ্গে নিগ্রো চাকরটা ছিলো, কখনো ছিলো টম সয়্যার। আমার সঙ্গে বাবু থাকলে বেশ হতো। বাবুকে এ কথা বললে ও এক্ষুনি হেসে খুন হবে, আর রাতে খাবার টেবিলে বাবা–মাকে বলে দেবে। তবে হাক ফিনের বইটা যে বাবুর ভালো লাগছে, সেটা আমি ঠিক টের পেয়েছি। মাঝে মাঝে ও মুখ টিপে হাসছে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

গত মাসে ভাইয়ার একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। কোথেকে লিখেছে বুঝতে পারি নি। চিঠিতে ভাইয়া কখনো নিজের ঠিকানা লেখে না। এর আগে ভাইয়ার আরো দুটো চিঠি পেয়েছিলাম আমি। একটা চিঠির খামের উপর পোস্ট অফিসের সিল পড়তে পেরেছিলাম আমি। বাংলাদেশে রাঙ্গাপানি নামে যে কোনো জায়গা আছে আমি জানতাম না। সার্ভের প্রকাণ্ড ম্যাপ খুঁজে বের করেছি। চট্টগ্রামের পাহাড়ের ভেতর একটা থানার নাম হচ্ছে রাঙ্গাপানি। চা বাগান আছে সেখানে। ভাইয়া চা বাগানে কী করছে বুঝি না। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি নি। ভাইয়া তিন বারই চিঠিতে বারণ করেছে, বাবাকে যেন চিঠির কথা না বলি। প্রথম চিঠিটা শুধু মাকে দেখিয়েছিলাম। ভাইয়াকে আমার দারুণ রহস্যময় মনে হয়।

ভাইয়ার শেষ চিঠিটা আমি বাবুকে দেখিয়েছি। বাবুকে চিঠি দেখাতে তো আর বারণ করে নি ভাইয়া। শুধু বলেছে গোপন রাখতে। আমি জানি বাবু গোপন রাখবে। কারণ আমার মতো বাবুরও কোনো বন্ধু নেই। ওর সব কথা আমাকেই শুনতে হয়। বাবু চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিলো, 'অপুদা বিপ্লবীদের দলে ঢুকেছে।' আমার কাছে ভাইয়া তখন আরো রহস্যময় হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম ভাইয়া বুঝি রবিনহুডের মতো একটা কিছু করছে। বাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি কী করে বুঝলে?' বাবু আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছে,'অপুদা তোমাকে যে বইগুলো পড়ার কথা বলেছে, পড়েছো?' ভাইয়া আমাকে বলেছিলো, ওর আলমারির নিচের তাকে যে বইগুলো আছে গরমের ছুটিতে যেন সেগুলো পড়ি। আমি শুধু 'যে গল্পের শেষ নেই', আর 'ইস্পাত' পড়েছি। আরেকটা শুরু করেছিলাম, কিছুই বুঝি নি। তাছাড়া চুপচাপ বসে পরীক্ষার পড়ার মতো প্রবন্ধের বই আমি বেশিক্ষণ পড়তে পারি না।

বাবু আমাকে বিপ্লবীদের অনেক কথা বলেছে। ও নাকি সিনেমায় দেখেছে বলিভিয়া, গুয়াটেমালা আর মেক্সিকোর বিপ্লবীরা কীভাবে কাজ করে। আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিলো বাবুকে বলি— 'চলো, আমরাও বিপ্লবীদের দলে যোগ দিই।' বাবু যদি মাকে বলে দেয়, সেই ভয়ে বলি নি।

প্রায় তিন বছর হতে চললো, ভাইয়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বাবা তখন এমন গম্ভীর থাকতেন যে, ভয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন। এক দিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাইয়ার কথা। মা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'তোর বাবার সঙ্গে মতের মিল হয় নি বলে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।' একটু পরে মা বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'অপু এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে।' মাকে যখন আমি ভাইয়ার প্রথম চিঠিটা দেখালাম, তখন মার চোখে অদ্ভুত এক আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিলো, যা আমি কোনোদিন দেখি নি।

ভাইয়া আমার চেয়ে আট বছরের বড়ো। তার ছোট আমার এক বোন ছিলো। ও নাকি জন্মাবার পর মাত্র ছ' মাস বেঁচেছিলো। বাড়িতে এখন আমি একা। মাঝে মাঝে ডিজনীর এ্যাডভেঞ্চারও একঘেয়ে মনে হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে যে কিছু করা যাবে না, এটা আমি পরিষ্কার বুঝেছি। বাবা বিকেলে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে চাইনিজ চেকার খেলেন। তাতে কি আর সময় কাটানো যায়!

দূরে আমাদের স্কুলের ঘড়িটায় বারোটার ঘণ্টা বাজলো। এক দুই করে আমি নয় পর্যন্ত গুনে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ঘণ্টা-বুড়ো পিটারের ক্লান্ত চেহারাটা মনে পড়লো। গলি দিয়ে ফেরিঅলারা লেস ফিতা, ঢাকাই শাড়ি বলে সুর করে ডেকে যাচ্ছিলো। আমি জানি ঢাকাই শাড়িঅলা বুড়ো হাতেমালি এখন চৌধুরীভিলার গাড়ি বারান্দার নিচে বসে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছে। কামরাঙ্গা গাছের কাকগুলো ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এখন বসে ঝিমুচ্ছে।

গত বছর এ সময়ে ছোট নানু আর নেলী খালা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়ির অনেক দিনের জমে থাকা গম্ভীর, গুমোট বাতাস নেলী খালা চোখের পলকে উড়িয়ে দিলেন। ছোট নানু ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। রিটায়ার করে বহু দিন পর দেশে ফিরেছেন। নেলী খালার প্রায় পুরো জীবনটাই বিদেশে কেটেছে। মা বলেছেন, নেলী খালার বয়স নাকি এখন সাতাশ। ছোট নানু কয়েক দিন থেকে কক্সবাজারে তাঁর নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। নেলী খালা গরমের ছুটির একটানা দু'মাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

বাবুকে নেলী খালার সব কথা বলে ফেলেছি। মার সঙ্গে রোজ এক বার করে নেলী খালার ঝগড়া হতো। নেলী খালা ছেলেদের মতো চুল কেটেছেন বলে মার রাগ, মার পছন্দ করা পাত্রকে নেলী খালা বিয়ে করবেন না বলে রাগ, নেলী খালা চাকরি না করে ব্যবসা করবেন বলে রাগ— এতো রাগ নিয়ে মা সারাক্ষণ নেলী খালার ওপর টং হয়ে থাকতেন। মা যতো রাগতেন, নেলী খালা ততো হাসতেন। আর মাকে আরো চটাতেন। একদিন নেলী খালা বললেন, 'জানো শানুপা, আমাদের ল্যান্ডলেডি মিসেস থম্পসন লেখাপড়া তেমন কিছু করেন নি। অথচ নিজে দু'দুটো দোকান চালান, ক্যাশ দেখেন, লাইসেন্স রিনিউ করানোর জন্যে ছুটোছুটি করেন। তুমি এতো সব ডিগ্রী নিয়ে জামান সাহেবের হেঁশেল ঠেলবে আর বসে বসে মোটা হবে, এটা কেমনতরো কথা!' শুনে বাবা হেসে বললেন, 'আমার ওপর দোষ চাপিও না নেলী, এক বার চাকরির কথা বলাতে সাত দিন তোমার বোন আমার সঙ্গে কথা বলে নি।' আর মা রেগেমেগে বললেন, 'দ্যাখো, আমাকে চটাবে না কিন্তু। শেষে আমি অনর্থ করবো।' মোটা হবার কথা বললে মা ভীষণ রেগে যেতেন। 'মেয়েদের কাজ মেয়েদের করা উচিত। মেয়ে হয়ে ছেলেদের কাজে নাক গলানো আমি একদম পছন্দ করি না।'

নেলী খালা মাকে বলতেন, 'এখনো তুমি এক্কেবারে সেকেলে রয়ে গেছো। কাজই যখন করবে না, তখন ডিগ্রী নেয়ার কী দরকার ছিলো?' বাবা গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'ডিগ্রী ছাড়া তোমার বোনকে আমি বিয়ে করতাম ভেবেছো?' নেলী খালা হেসে গুঁড়িয়ে যেতেন। ' এখন নিশ্চই আপনার মনে হচ্ছে ডিগ্রী থাকা আর না থাকা দুটোই শানুপার জন্যে সমান।' মা তখন এতো রেগে যেতেন যে কোনো কথা বলতে পারতেন না। উঠে গিয়ে রান্নাঘরে ক্ষেন্তির মাকে ঝেড়ে বকতেন, 'এতো বেলা হলো, এখনো তোমার...।'

মা যখন হার মানতেন, নেলী খালা তখন আমাকে নিয়ে পড়তেন। বলতেন, 'সকালবেলা ঝুপঝাপ করে কটা ডন আর বৈঠক করলেই শরীর ভালো থাকে না। তোমাকে তো খেলতে যেতে দেখি না আবির?'

আমি বলতাম, 'মাঠ কোথায় যে খেলতে যাবো? স্কুল খোলা থাকলে মাঝে মাঝে বাস্কেটবল প্র্যাকটিস করি।' শুনে নেলী খালা— 'কুছ পরোয়া নেই' বলে মিস্তিরি ডাকিয়ে

তিন দিনের ভেতর আমাদের ছাদে টেবিল টেনিস খেলার টেবিল বানিয়ে ফেললেন। আমি শিরীষ কাগজ ঘষে টেবিলটা মসৃণ করলাম। নেলী খালা রং লাগালেন। তারপর সকাল-বিকেল টেবিল টেনিস, দুপুরে এয়ার গান দিয়ে চাঁদমারি তাক করা, ক্রসওয়ার্ড পাযল-এসব সমানে চলতে লাগলো। সন্ধেয় বাবা ঘরে ফিরলে নেলী খালা মার সঙ্গে খুনসুটি করতেন। আর রাতে বাবা, মা, আমি, নেলী খালা সবাই মিলে চাইনিজ চেকার খেলে গরমেট ছুটির দুটো মাস যে কীভাবে কাটিয়ে দিলাম টেরই পেলাম না।

একদিন কক্সবাজার থেকে নানুর চিঠি পেয়ে নেলী খালা হুট করে চলে গেলেন। যাবার সময় মার সে কি ফোঁসফোঁস কান্না আর উপদেশ— 'নেলী, এটা বিলেত নয়, ঠিকমতো চলাফেরা করিস, আমার পছন্দমতো যখন বিয়ে করবি না, তখন নিজে দেখেশুনে একটা বিয়ে কর। মামারও তো বয়স হয়েছে। মামী বেঁচে থাকলে-' বলে মা আঁচলে চোখ মুছেছিলেন। মার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার হাসি পেলেও নেলী খালা চলে যাচ্ছেন ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিলো।

'তুমি কিসসু ভেবো না শানুপা। আমি ঠিক থাকবো।' এই বলে নেলী খালা মার গালে আর আমার কপালে চুমো খেয়ে গাড়িতে উঠলেন। নেলী খালা চলে যাবার পর আমাদের পুরোনো বাড়িটা যেন আরো একা, সময়গুলো যেন আরো বিষণ্ন হয়ে গেলো। আমি আবার আগের মতো দশটা-চারটা স্কুলে যেতে শুরু করলাম।

মা বলেন, নেলী খালার নাকি বড়ো ভুলো মন। মা এরকম অনেক কথাই বলেন। তবে যখন নেলী খালাকে এভাবে বকেন, তখন আমার ভালো লাগে না। আমি মাকে বলি, 'ভুলো মন হলে তোমাকে মাসে দুটো করে চিঠি লিখতো না।' মা তখন পান চিবুতে চিবুতে একগাল হেসে বলেন, 'ও তো মামার বকুনি খেয়ে লেখে। আর আমার চিঠির জবাব না দিলে আমিই বা লিখবো কেন বল!' নেলী খালা বাবা-মা দু'জনকেই আগের মতো হাসি-খুশি করে দিয়ে গেছেন।

জলপাই-সবুজ কাগজে মাকে চিঠি লিখতেন নেলী খালা। আমি মাকে বলে সব চিঠিই পড়তাম। দেখতাম, আমার কথা কী লিখেছেন, আর তিনি নিজে কী 'উদভুট্টি কাণ্ড' করলেন। মার ভাষায় নেলী খালা নতুন যা কিছু করেন সব নাকি 'উদভুট্টি কাণ্ড'। চিঠি পড়ে পান চিবুনো বন্ধ করে মা খুব গম্ভীর মুখে বাবাকে পড়তে দিতেন, 'দেখ, নেলীর কাণ্ডখানা দেখ।' বাবা পড়ে হাসতেন। আর মা রেগে যেতেন, 'হেসো না বাপু। ওর এসব উদভুট্টি কাণ্ড দেখে গা জ্বলে যায়। মামাটাও দিন দিন কী যেন হচ্ছেন!' বাবা হেসে বলতেন, 'মন্দ কি। নেলী নতুন কিছু করছে। ওকে উৎসাহ দেয়া উচিত। আমাদের এখানে এমনটি আগে কখনো হয় নি।' শুনে মা আরো রেগে যেতেন। বলতেন, 'মামাকে দুটো কড়া কথা লিখতে হবে।' নেলী খালা সব চিঠিতে আমাকে চুমো পাঠাবেন আর একটা 'উদভুট্টি কাণ্ড' করার কথা লিখবেন— যেটা পড়ে মা রেগে যাবেন আর বাবা হাসবেন।

একদিন নেলী খালা লিখলেন, 'শানুপা, ডিমের কারবারে সুবিধে করতে পারছি না। পাইকারগুলো বিট্রে করছে। তাছাড়া এখানে কোল্ড স্টোরেজ সিস্টেম নেই। প্রচুর লোকসান হচ্ছে।' মা চিঠিখানা জোরে জোরে পড়ে শোনালেন বাবাকে। তারপর বললেন, 'কেমন, আগে বলি নি এটা বিলেত নয়? তখন তো কানেই গেলো না। বোঝ এখন!' তারপর আরেক চিঠিতে নেলী খালা লিখলেন —'ভারি বিচ্ছিরি রকমের ঝিমুনি ধরেছে মুরগিগুলোকে। নামমাত্র দামে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। মুরগির ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবো।' মা একগাল হেসে বাবাকে বললেন, 'যাক বাপু, এ্যাদ্দিনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ব্যবসার ভূত তাহলে নেলীর ঘাড় থেকে নেমেছে।' বাবা শুনে মুখ টিপে হাসলেন।

মাকে বেশিদিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে হলো না। নেলী খালা পরের চিঠিতেই লিখলেন — 'চমৎকার বাজার পেয়েছি। তরকারির ব্যবসা শুরু করেছি। গ্রাম থেকে জীপে করে এনে

শহরে ছাড়বো। সহজে নষ্ট হবার ভয় নেই। চমৎকার হবে! কী বলো শানুপা?' মা তক্ষুনি গোল রিমের চশমাটা পরে মুখ কালো করে নেলী খালাকে লিখলেন, 'নেলী, তুমি তো কখনো আমার পরামর্শ গ্রহণ কর নাই। তোমার ভালো-মন্দ তুমিই বোঝ। তবে মেয়ে মানুষের ব্যবসা করাটা আমি ভালো মনে করি না। আমার কথা যখন শুনিবে না তখন তোমার যাহা খুশি করিতে পার। মামী বাঁচিয়া থাকিলে কখনো এইরূপ হইতে দিতেন না। আমি এখনো বলি, তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ। যদিও তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট আস্থা নাই, তবুও বলি নিজে দেখিয়া শুনিয়া একটি বিবাহ কর। নতুবা বল তো আমরা পাত্র দেখি। মামা কোনো দিন এ বিষয়ে ভাবিবেন না বলিয়া যেন পণ করিয়াছেন।'

মার এ ধরনের গুরুগম্ভীর চিঠির জবাবে নেলী খালা লিখলেন, 'শানুপা, এতো সুন্দরভাবে কাজ এগুচ্ছে যে কী বলবো! ইচ্ছে করছে তোমাকে এনে দেখাই। দশ-বারোটা গ্রাম ঘুরে ভেজিটেবল সংগ্রহ করা ভারি থ্রিলিং ব্যাপার। আর দর-দস্তুরের মতো মজার জিনিস দুটো নেই। তুমি যদি দেখতে শানুপা, তাহলে তোমারও শেয়ারে নেমে যেতে ইচ্ছে করতো।' চিঠি পড়ে মা তো বাবাকেই একচোট বকলেন, 'তুমি তো নেলীকে কিছুই লিখবে না। ওর আক্কেলখানা কি, দেখ তো! আমার নাকি তরকারি বেচতে ইচ্ছে করবে। ভাবো দেখি ব্যাপারটা!'

বাবা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে খুব গম্ভীর হয়ে মাকে ভালো করে দেখে বললেন, 'মানাবে। খুব একটা খারাপ লাগবে না।'

কথাটা শুনে আমার এতো হাসি পেলো যে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। মা রেগেমেগে দু'দিন বাবার সঙ্গে কথা বললেন না।

অনেক দিন হল নেলী খালার চিঠি আসছে না। বাবু ছাড়া আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। অথচ চিঠি পেতে আমার খুব ভালো লাগে। নেলী খালার চিঠিগুলোতে যদিও মজার মজার কথা থাকে, কিন্তু আমার জন্যে শুধু একটা করে চুমো। বাবুর চিঠি সবটাই আমার। আমি বার বার পড়ি। তারপর লম্বা একটা চিঠি লিখে পনেরো দিন অপেক্ষা করি। ওর চিঠি পেতে এক দিন দেরি হলেও আমার ভীষণ রাগ হয়।

দমকল আপিসের পেটা ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বাজলো। বাবু বইটা শেষ করে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'কেমন লাগলো ?' বাবু শুধু বললো, 'চমৎকার!'

স্কুল না থাকলে আমরা বারোটা বাজার আগেই দুপুরের খাবার খাই। বিকেলে বাবা এলে জলখাবার। মা তখন লুচি, নয় ভাসা-পরোটা ভাজেন। আলুর দম তৈরি করেন। মা চমৎকার রান্না করেন। খাবার টেবিলে বসে বাবু এত প্রশংসা করে যে, মা লাল-টাল হয়ে ওর পাতে দুটোর বদলে চারটা মাছের টুকরো তুলে দেন। আমার তখন খুব হাসি পায়। মার বকুনির ভয়ে খাবার টেবিলে হাসা যায় না।

বাবু হাই তুলে বললো, 'আজ প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নাও।'

ও মাথা নাড়লো —'আমি দিনে ঘুমোই না।'

বাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়া দেখছিলো। একটা ঘুড়ি সুতো ছিঁড়ে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে গেলো। বাবু বললো, ' আমরা যদি হাক ফিনের মতো একটা এ্যাডভেঞ্চার করতে পারতাম, তাহলে দারুণ মজা হতো।'

আমি বললাম, 'তুমি তো ক'দিন পরই চলে যাবে। আমার তখন খারাপ লাগবে। একা থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় ভাইয়ার মতো কোথাও বেরিয়ে যাই।'

বাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'তোমাকে তো বলেছি আবির, কলাম্বিয়াতে আমার কোনো বন্ধু নেই। তোমার চিঠি পেলে কী যে ভালো লাগে ! তুমি খুব সুন্দর লিখতে পারো। আমি তোমার মতো লিখতে পারি না।'

'তুমি কি আমার কথা খুব ভাবো বাবু ?' —আমি মনে মনে কথাগুলো বললাম।

বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর একটু হেসে বললো, 'আমাদের দুটো মেয়ে বন্ধু থাকলে খুব মজা হতো।'

আমি হেসে ফেললাম— 'ওখানে তো তোমার বান্ধবীর অভাব হবার কথা নয়।'

বাবু আগের মতো হেসে মাথা নাড়লো— 'ওখানকার মেয়েদের আমার ভালো লাগে না।'

গরমের দুপুরগুলো এতো বড় যে কাটতেই চায় না। চারিদিক কেমন সুমসাম। একটা ঘুমঘুম ভাব। চারপাশের দালান, কার্নিশে বসা শালিক, এখানে সেখানে একটা দুটো গাছের মাথা— সব কিছু যেন গরমে ক্লান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছে। চিলেকোঠার পুরোনো ফ্যানটা পুরো স্পীডে কটকট শব্দ করে ঘুরছে। মনে হচ্ছে ফ্যানের ভেতর থেকেও গরম বাতাস বেরুচ্ছে।

বাবু বললো, 'তোমার নেলী খালা তো তোমাকে খুব ভালোবাসেন।'

আমি বললাম, 'বাসে। তবে নেলী খালা আমাকে তো আর চিঠি লেখে না।'

বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখানে তো তুমি ভালোই আছো। মা বাবা আছেন, নেলী খালা আছেন। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারো। ওখানে ডরমেটরিতে থেকে একা আমার সময়গুলো কীভাবে কাটে একবার ভাবো তো !'

আমি একা থাকি বলে একা থাকার কষ্ট সব সময় অনুভব করি। ওকে বললাম, 'বাবা বলেছে ইশকুল ফাইনালের পর আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আমরা একসঙ্গে থাকবো।'

বাবু হেসে বললো, 'সে তো দু'বছর পরের কথা। এখন যে দু'মাস একসঙ্গে থাকবে একটা কিছু তো করতে হবে। এভাবে ঘরে বসে আর কদ্দিন কাটাবো ?'

আমি বললাম, 'কাল চলো, নদীর ওপারে যাবো। নৌকোয় ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে।'

চিলেকোঠার ছায়াটা ছাদের ওপর আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে পড়লো। রোদের ঝাঁঝটা একটু কমে এলো। চৌধুরীদের কামরাঙ্গা গাছের কাকগুলো আর আমাদের ছাদের কার্নিশের ছায়ায় বসা শালিকগুলো উড়ে চলে গেলো। আকাশে একটা দুটো ঘুড়ি উড়তে শুরু করলো। আমি আর বাবু তখন টেবিল টেনিস খেলতে গেলাম।

ভাগ্যিস গত বছর নেলী খালা টেবিলটা বানিয়েছিলেন। রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আগের মতো মসৃণ রয়েছে। ক্ষেন্তির মা রোজ দু'বেলা টেবিলটা মুছে রাখে। বলে, 'মেম খালাম্মা যখন আবার আসবেক তখন মোকে বোকবেক। আমি বাপু তার মদ্দি নেই।' তারপর বলে, 'আহা, কী ভালো ছিলেক গো মেম খালাম্মা ! যাবার বেলায় মোকে নুকিয়ে দশটে টাকা দিলেক বটে। আর ক্ষেন্তির জন্যে একখান বাহারি বোম্বাই শাড়ি। শাড়িখান আমি তুলে রেখেচি। হ্যাগো ছোট মেয়া, আবার কবে আসবেক গো মেম খালাম্মা?

ক্ষেন্তির মা নেলী খালাকে বলে 'মেম খালা'। প্রথম দিন দেখে গালে হাত দিয়ে মাকে বলেছিলো, 'ও আম্মা, আপনার বুনটিকে দেখে মেম নোকের পারা মনে লয় গো।' নেলী খালা শুনে হেসে কুটোপাটি ! বললেন, 'তাহলে আমাকে তুমে মেমই ডেকো।'

'নেলী খালা গতবারের মতো যদি এবারও আসতেন, তাহলে খুব মজা হতো।' খেলতে খেলতে কথাটা বাবুকে বললাম। বাবু শুনে দারুণ খুশি হয়ে বললো, 'তাহলে আজই একটা চিঠি লিখে দাও।'

আমার চিঠি লেখার আগেই নেলী খালার চিঠি এসে গেলো। বিকেলে খাবার টেবিলে যখন ফুলকো লুচি দিয়ে ডিমের কালিয়া খাচ্ছি, তখন দেখলাম মার চেহারাটা খুব গম্ভীর। বাবা বাবুকে বললেন, 'কি বাবু, কেমন লাগছে সব ?'

বাবুর মুখে তখন আস্ত একখানা লুচি। কথা বলার মতো অবস্থা ছিলো না। ও শুধু ঘাড় নাড়লো। আমি হাসি চাপতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেললাম। মা কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। বাবু মুখের লুচিটা সাবাড় করে মাকে বললো, 'কী চমৎকার কালিয়া ! আমি জীবনেও এতো চমৎকার রান্না খাই নি।' আমি মার দিকে তাকালাম। নির্ঘাত একগাল হেসে বাবুর পাতে আরেক চামচ তুলে দেবেন। কিন্তু মা হাসলেন না। লালও হলেন না। যেন কথাটা তাঁর কানেই যায় নি। গম্ভীর হয়ে বাবাকে বললেন, 'নেলীর চিঠি এসেছে।'

আমি বাবার দিকে তাকালাম। আগের মতো বাবা নিশ্চয়ই মাকে পড়তে বলবেন। বাবা খেতে খেতে বললেন, 'কী লিখেছে?'

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। মা নিজে না পড়ে চিঠিখানা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো।'

হাত ধুয়ে বাবা চিঠিখানা পড়লেন। পড়তে পড়তে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়লো। আগের মতো চিঠি শেষ করে হাসলেন না। বরং গম্ভীর হয়ে মাকে বললেন, 'এ কাজটা নেলী ভালো করে নি।'

মা উদাস গলায় বললেন, 'তুমি তো এ্যাদ্দিন গা করো নি, নেলী কোনদিনই বা ভালো কাজ করেছিলো ! মামার জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার। বুড়ো বয়সে এরকম টানা–হ্যাঁচড়া !'

বাবা বললেন, 'মামার মত দেয়া উচিত হয় নি।'

আমি আর বাবু দু'জন দু'জনের দিকে তাকালাম। বাবুর চোখে প্রশ্ন। আমারও। বাবু আমাকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করতে বললো। আমি ঢোক গিলে মাকে বললাম, 'মা, নেলী খালার কী হয়েছে।'

মা মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হবে আর কি ! মাথায় ভূত চেপেছে।'

বাবা আমার দিকে তাকালেন —'তোমার নেলী খালা কক্সবাজারের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কোথায় কোন নুলিয়াছড়িতে একটা অনেক দিনের পুরোনো জমিদার বাড়ি কিনেছে। কক্সবাজার থেকে তিরিশ মাইলের মতো দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে। বার্মার বর্ডার নাকি ওখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে।'

মা বললেন, 'আর বাড়িরও বলিহারি যাই। আশেপাশে আধ মাইলের ভেতর কোনো জনমানুষ নেই। নেলী নাকি ওটাকে সরাইখানা বানাবে। পেয়িংগেস্ট রাখবে। শুনে পিত্তি জ্বলে যায়।'

বাবা কিছু না বলে উঠে চলে গেলেন। বোঝা গেলো নেলী খালার এই 'উদভুট্টি কাণ্ড'খানা বাবাও পছন্দ করেন নি। আমার কাছে সবকিছু ঝাপসা মনে হলো।

রাতে খাবার পর মা যখন পান চিবুতে চিবুতে আমাকে ডেকে তাকের ওপর থেকে দোক্তার কৌটোটা নামিয়ে আনতে বললেন, তখন আমি বললাম, 'নেলী খালার চিঠিটা পড়তে দেবে মা ?'

'আলমারির মাথায় রেখেছি, আবার হারায় না যেন। ওতে নেলীর নতুন ঠিকানা লেখা আছে।'

নেলী খালার চিঠি নিয়ে এক ছুটে আমার ঘরে এলাম। বাবু সেখানে আমার জন্যে বসে ছিলো। চার পাতার মস্ত চিঠি। দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। চিঠির সবটাই সেই অচেনা

নুলিয়াছড়ির বর্ণনা। নেলী খালা যেভাবে লিখেছেন, মনে হয় না বাংলাদেশে এতো সুন্দর আর রহস্যময় কোনো জায়গা থাকতে পারে। চিঠির শেষ ক'লাইন পড়ে আমি আর বাবু দু'জন একসঙ্গে দু'জনের দিকে চোখ তুলে তাকালাম ! নেলী খালা লিখেছেন, 'আবিরের তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এই গরমে ওকে রূপলাল লেনের গলিতে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। ছেলেটাকে তুমে যেভাবে আঁচলের তলায় রেখে দিয়েছো, ভবিষ্যতে ও কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। ছুটির ক'টা দিন আমার কাছে থাকুক। সমুদ্রের বাতাসে শরীরটাও ভালো হবে। আসছে রোববার দুপুরে আমি ওকে আনার জন্যে চট্টগ্রাম স্টেশনে থাকবো। তোমার কর্তার নিশ্চয়ই অমত হবে না।' এরপর নেলী খালা বাবার কথা লিখেছেন।

চিঠি পড়া শেষ করে দু'জন চুপচাপ বসে রইলাম। আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না। নেলী খালার জলপাই–সবুজ রঙের চিঠিটাকে মনে হলো ভূমধ্যসাগরের কোনো জলপাই দ্বীপে যাবার ডাক এসেছে। বাবু কী যেন ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'তুমি তাহলে নুলিয়াছড়ি যাচ্ছো ?'

ওর গলাটা কেমন যেন বিষণ্ন মনে হলো। আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, 'তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।'

বাবু হাসলো। হাসলে ওকে ভারি সুন্দর দেখায়। বললো, 'রোববারের আর তিন দিন।'

পরদিন সকালে খাবার টেবিলে মাকে বললাম, 'মা, নেলী খালা যে আমাকে যেতে বলেছে তুমি বলো নি কেন ?

মা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন, 'বলি নি আমার ঘাট হয়েছে। যাও, রোববার সকালের ট্রেনে উঠে আমায় কেতাথ করো।'

আমি বললাম, 'বাবুও আমার সঙ্গে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তা তো যাবেই। ও কি এখানে একা থাকবে নাকি! তোমাদের যাবার ব্যাপারে কাল রাতে তোমার মার সঙ্গে কথা বলেছি। নেলীকে আমি আজই টেলিগ্রাম করে দেবো।'

তারপর দুটো দিন যেন চোখের পলকে কেটে গেলো। আমি আর বাবু সারাদিন টেবিল টেনিস, চাইনিজ চেকার খেলে আর নানারকম প্ল্যান কষে সময় কাটিয়ে দিলাম। মা সারাক্ষণ পেছনে লেগে রইলেন —'জামাকাপড় কী নিতে হবে, সব কি আমাকে করতে হবে নাকি ? আচার আর ডালের বড়ির কথা যাবার সময় যেন ভুলে যেও না।'

একগাদা লটবহর নিয়ে মা–বাবা রোববার কাক–ভোরে আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে এলেন। মা ফোঁসফোঁস কান্না জুড়ে দিলেন। ট্রেন চলতে শুরু করলো। বাবা হাত নাড়লেন। বললেন, 'নেলীকে টেলিগ্রাম করতে বোলো।'

প্ল্যাটফর্মটা যতোক্ষণ দেখা গেলো, ততোক্ষণ মা আর বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মার জন্যে আমার কষ্ট হলো। মা সবার জন্যে এতো ভাবেন যে সামান্য কিছুতেই কেঁদে ফেলেন। মা–বাবাকে ছেড়ে এই প্রথম আমি বাইরে যাচ্ছি। যখন প্ল্যাটফর্মটা আর দেখা গেলো না, তখন আমি কামরার ভেতরে তাকালাম। বাবু জিনিসপত্র সব গুটিয়ে রেখে আমার পাশে এসে বসলো। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'আমরা সত্যিই তাহলে নুলিয়াছড়ি যাচ্ছি।'

আমিও তেমনি তেমনি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'না, জলপাই দ্বীপ।'

নুলিয়াছড়ির অভিশপ্ত বাড়ি

স্টেশনে শ্যাওলা–সবুজ রঙের শাড়ি পরা নেলী খালাকে দেখামাত্র সারা পথের একঘেয়েমির কথা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম। ট্রেনে উঠলে প্রথম দিকে আমার ভালো লাগলেও শেষে মনে হয় পথ ফুরালেই বাঁচি। ট্রেনটা আস্তে আস্তে থামছিলো। নেলী খালা এদিক–ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আমি জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকলাম, 'নেলী খালা !'

নেলী খালা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত কামরার সঙ্গে দৌড়োতে শুরু করলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপর মস্ত বড়ো এক ট্রাঙ্কের ওপর পানদান হাতে বসেছিলেন ইয়া মোটা এক বিহারী ভদ্রমহিলা। দৌড়োতে গিয়ে নেলী খালা ভদ্রমহিলার দামী কাতান শাড়ির জরির কাজ করা আঁচলটা মাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা কটমট করে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে কি সব বলে চেঁচাতে লাগলেন। আমি আর বাবু নেলী খালার 'উদভুট্টি কাণ্ড' দেখে হেসে খুন।

ট্রেন থামলো। হাঁপাতে হাঁপাতে নেলী খালা বললেন, 'তোরা এলি তাহলে ! ঝাড়া আধা ঘণ্টা বসে আছি।' এই বলে আমাদের বড়ো সুটকেস দুটো টেনে নামালেন। আমরা এয়ার–ব্যাগ আর বেতের ঝুড়িটা নিয়ে নামলাম।

বাবুকে দেখে নেলী খালা বললেন, 'এই বুঝি বাবু ? এ তো দেখি ক্ষুদে ওমর শরীফ!'

ক'দিন আগে আমি ওমর শরীফের একটা ছবি দেখেছিলাম। ওই ছবিতে ওমর শরীফ এক পাদ্রী সেজেছিলো। মাথার মাঝখানে ছোট্ট বাটির মতো সাদা টুপিটা দেখে মনে হয়েছিলো, ওখানটায় বুঝি গোলা করে চুলগুলো কেউ চেঁছে দিয়েছে। মনে পড়তেই আমি হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আর বাবুর তো কান লাল হয়ে গেলো।

নেলী খালা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এতো হাসির কী হলো ! ওমর শরীফ আমার ফেভারিট এ্যাকটর। ঝুড়িটা আমাকে দাও। সুটকেসগুলো আশা করি তোমরা নিতে পারবে।'

একটা কুলি এসে নেলী খালার হাত থেকে ঝুড়িটা নিতে চাইলো। নেলী খালা বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, 'কেন ভাই কষ্ট করবেন, আমিই তো দিব্যি নিতে পারি।' নেলী খালার কথা বলার ভঙ্গি দেখে কুলিটা জিব কেটে পালিয়ে বাঁচলো।

স্টেশনের বাইরে যেতে যেতে নেলী খালা আমাকে বললেন, 'ওজন দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা সারা বছর থাকার মতলব নিয়ে এসেছো।'

আমি হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বেতের ঝুড়ির সব জিনিসই তোমার নেলী খালা। রীতিমতো একখানা হেঁশেল সাজিয়ে দিয়েছেন বলতে পারো।'

দু'হাতে ধরে বেতের ঝুড়িটা জীপের পেছনে তুলে নেলী খালা ড্রাইভিং সীটে বসলেন। আমরা দু'জন বসলাম তাঁর পাশে। ব্যাক গিয়ারে চমৎকার পাশ কাটিয়ে নেলী খালা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'আমার আরো দুটো গেস্ট আছে। মিরাবুর মেয়েরাও

আমাদের সঙ্গে যাবে। বেচারীরা এতোক্ষণে নির্ঘাত আমার ওপর চটে আছে। আমি ওদের দেড়টায় তুলে নেবো বলেছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার মিরাবু কে নেলী খালা ? আগে তো কখনো বলো নি !'

নেলী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'বলি নি তোকে অবাক করে দেবো বলে। ওঁর দুটো চমৎকার মেয়ে আছে। ললি আর টুনি। তোর কথা শুনে আলাপ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তুই যে লুকিয়ে কবিতা লিখিস, এ কথা ওদের বলে দিয়েছি।'

আমি আড়চোখে বাবুর দিকে তাকালাম। বাবু ঘাড় ফিরিয়ে দোকানপাট দেখতে লাগলো। পাঁচ মিনিটের ভেতর আমরা ললি, টুনিদের বাড়িতে এসে গেলাম। মার বয়েসী স্মার্ট এক জন ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওরা বারান্দায় বসেছিলো। নেলী খালা গাড়ি থেকে নামলেন না। বললেন, 'ললি টুনি ঝটপট পেছনে উঠে পড়ো। আলাপ-টালাপ সব পরে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সন্ধের ভেতরে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।' তারপর আমাকে আর বাবুকেও ঠেলে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের পেছনে উঠতে দেখে ললি টুনির ছোটটি জিব বের করে ভেংচি কাটলো। ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

নেলী খালা বললেন, 'বুড়ো মুৎসুদ্দিকে তুলতে হবে। আমার জন্যে বেচারা দাঁড়িয়ে থাকবেন। মিরাবু, তুমি কিসসু ভেবো না। আমি কক্সবাজার থেকে ফোন করবো।'

নেলী খালা গাড়ি ঘোরালেন। ওর মিরাবু পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভাবতে সময় দিলি কই নেলী, সাবধানে ড্রাইভ করিস বাছা। ছোট মামাকে মনে করে, আমার...' তাঁর কথা আর শোনা গেলো না। নেলী খালা প্রচণ্ড স্পীডে গাড়ি চালালেন।

আমি আর বাবু ললি টুনির মুখোমুখি বসেছিলাম। দু'জনেই বেলবটম প্যান্ট আর ফ্রিলের জামা পরেছে। নেলী খালা বললেন, 'ললি, তোমাদের ব্যাগ নিয়েছো তো ?' একটা মেয়ে মিষ্টি হেসে বললো, 'নিয়েছি নেলী খালা।' বুঝলাম, ওরই নাম ললি।

ললির চুলগুলো বব্‌ছাঁট করা। মুখটা আদুরে রাশান পুতুলের মতো। চোখে রোল গোল্ডের চশমা। আর টুনি, যে আমাকে দেখছিলো— ওর চুলগুলো লম্বা হলেও ওকে ললির চেয়ে বেশি স্মার্ট মনে হলো। লম্বা চুল দিয়েও মাথার দু'পাশে বেণীর বদলে দুটো খোঁপা করেছে। খোঁপা দুটো আরেকটু উঁচুতে বাঁধা হলে ঠিক দুটো শিং-এর মতো মনে হতো। কথাটা ভেবে আমি হেসে ফেললাম। টুনি সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'এই, আমাকে দেখে হাসছেন কেন? খবরদার, হাসতে পারবেন না।'

ওর কথা বলার ধরন দেখে আমি আর বাবু দু'জনেই হেসে ফেললাম। ললি একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'তুমিই ওকে হাসাচ্ছো টুনি। গাড়িতে ওঠার সময় তুমি জিব বের করেছিলে কেন? তোমার জামার কলার ঠিক করো।'

টুনি তড়বড় করে বলে উঠলো, ' এ মা, তুমি কী মিথ্যুক ললিপা ! তুমিই তো আমাকে জিব দেখাতে বললে। আর নিজে এখন—।'

ললি হেসে ফেলে বললো, 'ভালো হবে না বলছি টুনি।'

ললি আর টুনি দু'জনকেই আমার ভালো লেগে গেলো। বাবুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ও মিটি মিটি হাসছে। মনে হলো বাবুরও ভালো লেগেছে।

শহর থেকে বেরিয়ে মস্ত বড়ো এক ছাতিম গাছের তলায় এসে নামলেন নেলী খালা। ছাতিমতলা থেকে গুটি গুটি পায়ে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। 'আসুন মিঃ মুৎসুদ্দি।' নেলী খালা বললেন, 'আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। ভারি দুঃখিত।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি গাড়িতে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে বললেন, 'শরীর খারাপের কথা বলছেন? তা বয়স তো আর কম হয় নি।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বুড়ো মুৎসুদ্দি কিছুই দেখতে পেলেন না। গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই তিনি ডান হাতটা ডান কানের পাশে নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'শুনলাম মিস চৌধুরীরা নাকি নুলিয়াছড়ির হার্মাদদের ভূতুড়ে বাড়িটা কিনেছেন ?'

নেলী খালা বললেন, 'তা একরকম কিনেছি বলতে পারেন। আপনি কার কাছে শুনলেন?'

বুড়ো মুৎসুদ্দি আগের মতো চেঁচিয়ে বললেন, 'কী বললেন ? ভূত বলে কিছু নেই নাকি?'

বাবু বললো, 'এ যে দেখি প্রফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের চিল্লানোরাসের মতো চ্যাঁচাচ্ছে?'

বাবু আমাদের বাসায় সুকুমার রায়ের লেখা প্রফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রী গল্পটা পড়েছিলো। আমি হেসে নেলী খালাকে বললাম, 'এই চিল্লানোরাস মুৎসুদ্দি সায়েবটি করেন কী ?' নেলী খালা পেছনে না তাকিয়ে জবাব দিলেন —'উনি কক্সবাজারের একটা মোটেলের মালিক।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি বললেন, 'ওটা যে ভূতুড়ে বাড়ি, আপনার বিশ্বাস হয় না বুঝি ! তালুকদারদের ওয়ারিশটা তো দিব্যি মোটেল ফেঁদে বসেছিলো। কেন আপনাকে আদ্ধেক দামে বেচে রেঙ্গুন পালালো, বুঝতে পারেন নি ? আসলে ওটা একটা অভিশপ্ত বাড়ি।'

ললি বললো, 'অভিশপ্ত বাড়ি কেন বলছে নেলী খালা ?'

নেলী খালা বললেন, 'কী জানি বাপু। সস্তায় পেয়েছি বলে সবার হয়তো গা জ্বালা করছে, তাই আর কি।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি বললেন, 'তাই বলুন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আজকালকার ছেলেদের মতো ভূত বিশ্বাস করেন না। ঠিক আছে, আমাদের মঠ থেকে আপনাকে রক্ষা কবচ এনে দেবো।'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'বুড়োকে নিয়ে এ এক জ্বালা ! সারাক্ষণ কানের কাছে চ্যাঁচাবেন। আবির ঠিকই বলেছো— আস্ত একখানা চিল্লানোরাস।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি একগাল হাসলেন— 'না, না, ধন্যবাদের কী আছে ! প্রতিবেশীর যদি এটুকু উপকার না করতে পারি।'

আমরা সবাই আরেক দফা কোরাসে হাসলাম। পকেট থেকে একটা চুইংগাম বের করে বুড়ো মুৎসুদ্দি টুপ করে মুখে ফেলে নেলী খালার সঙ্গে তাঁর মোটেলের গপ্পো জুড়ে দিলেন। নেলী খালার যে সে-সব গপ্পো শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলো না— তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। কিন্তু দু'হাত নেড়ে বুড়ো যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন, না শুনে উপায়ও ছিলো না।

আমি চোখ তুলে ললির দিকে তাকালাম। ললি আমাকেই দেখছিলো। মুখ টিপে হেসে ও বাইরের গাছপালা দেখতে লাগলো। বাবু টুনির সঙ্গে কোন ক্লাসে পড়া হয়-টয়, এ ধরনের কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। আর টুনিও ওর ঝোলানো শিং-এর মতো খোঁপা দুটো নেড়ে নেড়ে সে-সব কথার জবাব দিচ্ছে। আমার কেমন যেন ঘুম ঘুম লাগছিলো। আড়চোখে আর এক বার ললির দিকে তাকালাম। তখনো ললি পাহাড়-নদী এসব দেখছিলো। বাতাসে ওর রেশমের মতো নরোম লালচে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছিলো। ললির চেহারা দেখে মনে হয় ওর বোধ হয় কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই। একটু আদুরে ভাব। অথচ আমাকে আর বাবুকে দেখলেই মনে হয় আমাদের অনেক দুঃখ। একা থাকার দুঃখটা সারাক্ষণ আমাদের পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। মনে মনে ভাবলাম নুলিয়াছড়িতে গিয়ে ললিকে আমার বন্ধু হতে বলবো। বাবুর মনে হয় টুনিকে ভারি পছন্দ হয়ে গেছে। ওরা দু'জন হাসছিলো আর কথার ঝর্না বইয়ে দিচ্ছিলো। বাবু যে এত কথা বলতে পারে, আগে

কখনও টের পাই নি। ললিকে মনে হলো, ও বোধ হয় চুপচাপ থাকতে ভালোবাসে। আমি নিজেও বেশি কথা বলতে পারি না।

শেষ বিকেলে আমরা কক্সবাজারে এলাম। বুড়ো মুৎসুদ্দিকে তাঁর মোটেলে নামিয়ে দেয়া হলো। নেলী খালাকে একগাদা ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। একগাল হেসে বললেন, 'হায় ঈশ্বর ! এই ক্ষুদে ডাকাতদের এতোক্ষণ আমার চোখেই পড়ে নি !'

টুনি ফিক করে হেসে ফেললো। বললো, 'আগে দেখতে পেলে যে চুইংগামের ভাগ দিতে হবে। গাড়িতে ওঠার পর একটার পর একটা কেবল খেয়েই যাচ্ছেন।'

চুইংগাম কথাটা বোধ হয় বুড়ো মুৎসুদ্দির কানে ঢুকেছে। বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে— না, ভুল বললাম, ওঁর সামনের চারটা দাঁত নেই— আটাশটা দাঁত বের করে তিনি পকেটে হাত দিলেন। একগাদা চকলেট আর চুইংগাম বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'চললাম ভাই ডাকাতের দল। পরে দেখা হবে।'

নেলী খালা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। আমাকে বললেন, 'আবির সামনে আসবে নাকি ?' ললির দিকে তাকালাম। একটু হেসে বললাম, 'থাক নেলী খালা, এখানে বেশ আছি।'

'গুড বাই কক্সবাজার' লেখা সাইনবোর্ডটাকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে গেলাম। কিছু দূর গিয়ে নেলী খালা সমুদ্রের বীচে নেমে গেলেন। বললেন, 'বীচ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবো।'

সমুদ্র তখন শেষ বিকেলের সোনালি রোদের আলোতে ঝলমল করছিলো ! বড়ো বড়ো ঢেউগুলো তীর থেকে ভেতরে এসে অনেক দূর পর্যন্ত নরম বালিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। আমাদের বাঁ পাশে খাড়া পাহাড়গুলো সোজা উঠে গেছে। পাহাড়ের মাথায় ঘরবাড়ি। ঝাউবনে শাঁ শাঁ বাতাস বইছে। বাতাসে আমাদের সবার চুল-টুল সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ললি চুইংগাম চিবুতে চিবুতে বললো, 'চিল্লানোরাস মুৎসুদ্দি আসলে কিন্তু খারাপ লোক নয়।'

নেলী খালা বললেন, 'ক'টা চুইংগাম পেয়েই পছন্দ হয়ে গেলো ! আবিরের কপালটা দেখছি ভালো নয়।'

লজ্জায় গাল দুটো লাল হয়ে গেলো ললির—'নেলী খালা, ভালো হবে না বলছি।' আমি মুখ ফিরিয়ে সমুদ্র দেখতে লাগলাম।

হিমছড়ি পেরুনোর পর আমাদের পাহাড়ী পথ ধরতে হলো। দু'পাশে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে। কিছু দূর যাবার পর ছোট একটা বাজারের মতো মনে হলো। কয়েকটা খড়ের ঘর, দোকানপাট এইসব। লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে হলো বার্মিজ। মেয়েরাও লুঙ্গি পরেছে। নেলী খালা বললেন, 'এটা নুলিয়াছড়ির হাট। আর প্রায় এক মাইল পথ যেতে হবে।'

রাস্তার ওপর গজিয়ে থাকা ঘাস দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে এ পথে কেউ খুব একটা চলাফেরা করে না। চারদিক কেমন ঠাণ্ডা, সুমসাম। সন্ধে হয়ে এসেছে। দু'পাশে বুনো ঝাউ আর দেবদারু বন পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নেমে গেছে।

একটু পরে গাড়িটা পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা মোড় নিতেই চোখে পড়লো নেলী খালার সেই বাড়ি। পাহাড়ের মাথায় কালো ছায়ার মতো একটা দুর্গ যেন। পশ্চিমের বিশাল আকাশে লাল বেগুনি আর কালো মেঘের ঘনঘটা। সন্ধেবেলার আবছা আলোতে বাড়িটা অজানা সব রহস্য গায়ে জড়িয়ে একা গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো। মস্ত কাঠের গেট পেরিয়ে গাড়ি বারান্দার নিচে আসা পর্যন্ত কেউ কোনো কথাও বলতে পারলাম না।

গাড়ির শব্দ শুনে ঘেউ ঘেউ করে প্রকাণ্ড কালো শরীর আর লোমঅলা একটা কুকুর ছুটে এলো। আর হারিকেন হাতে এলো বর্মী চোহারার একটা ক্ষুদে দৈত্যের মতো লোক।

নেলী খালা মিষ্টি গলায় ডাকলেন, 'স্ক্যাটরা!' কুকুরটা এক লাফে নেলী খালার গায়ে উঠে তাঁর গাল-টাল সব চেটে একাকার করে দিলো। হাসতে হাসতে নেলী খালা বললেন, 'থাক থাক খুব হয়েছে । বাথিন, জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেলো। আবিরবা দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

ক্ষুদে দৈত্যটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলো। ললি ঢোক গিললো। আমি ওর কাছে এসে বললাম, 'চলো ললি, ভেতরে যাই।

নেলী খালা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'বড়িবি, গ্যাস লাইটগুলো জ্বালো নি কেন? বাড়িটাকে একেবারে কবর বানিয়ে রেখেছো দেখছি !'

আমরা চার জন নেলী খালার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলাম। এক-একটা ঘর প্রকাণ্ড বড়ো। দেয়ালে বাতিদানে টিমটিমে আলো জ্বলছে। ঘর জুড়ে একটা ছায়া ছায়া ফিকে অন্ধকার। স্টাডিরুমে বসে মোটা একটা চুরুট টানছিলেন নানু। আমি গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। আসার সময় মা পই পই করে নানুকে সালাম করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার দেখাদেখি বাবু, ললি আর টুনিও নানুকে সালাম করলো। নানু বললেন, ' তোমাদের কোনো কষ্ট হয় নি তো আবির ?'

আমি মাথা নেড়ে বললম, ' না, নানু। একটুও কষ্ট হয় নি।'

নানু নেলী খালাকে বললেন, 'নেলী, ওদের ঘরে নিয়ে যাও। সবার চোখমুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। আমি খাবার টেবিলে আলাপ করবো।'

নেলী খালা বললেন, 'চলো সবাই।। দোতালায় তোমাদের জন্যে দুটো রুম রেডি করে রেখেছি। সবগুলো ঘর এখনো গুছিয়ে উঠতে পারি নি। কাল থেকে তোমরা সবাই আমাকে ঘর সাজাতে সাহায্য করবে।'

দোতালায় ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলো যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। ভারি সেগুন কাঠের সিঁড়ির বাঁকগুলোতে মিটমিটে দেয়াল-বাতি জ্বলছিলো। নেলী খালা বললেন, 'ইলেকট্রিসিটির জন্যে এ্যাপ্লাই করেছি। আশেপাশে কোথাও নেই বলে ঝামেলা হচ্ছে।'

সিঁড়ির শেষে দোতালার লম্বা করিডোর। নেলী খালা দুটো মুখোমুখি ঘর দেখিয়ে বললেন, 'একটা আবির আর বাবুর , আরেকটা ললি আর টুনির। ভাগ্যিস ফার্নিচারসহ পেয়েছিলাম। নইলে এতো বড়ো বাড়ির ফার্নিচার কিনতে কিনতে আমাকে ফতুর হতে হতো। একা থাকতে ভয় করবে না তো ললি টুনি ?'

টুনি শুকনো গলায় বললো, ' না, ভয় করবে কেন ?' বোঝা গেলো টুনি বেশ ভয় পেয়েছে।

বাবু হেসে বললো, 'ভয় কী টুনি! আমরা তো কাছেই আছি।'

টুনির ভয়টা ধরা পড়ে যাওয়াতে ও চটে গিয়ে বললো, 'থাক, বেশি বাহাদুরি করতে হবে না! দেখা যাবে কারা ভয় পায়।'

ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড একটা খাট। নতুন বিছানা পাতা। দেয়ালে একটা ডিমের মতো বড়ো আয়না। তার সামনে পেল্লাই এক কাঠের সিন্দুক। কোনায় শ্বেতপাথরের টেবিলে কালো পাথরের ফুলদানি। ফার্নিচারগুলোতে নতুন পালিশ দেয়া হয়েছে। হালকা নীল ডিসটেম্পার করা দেয়াল। ফুলদানিতে ফুলসুদ্ধো এক কামিনীর ডাল। ঠাণ্ডা মিষ্টি একটা গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিলো। আমি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'চমৎকার নেলী খালা !'

নেলী খালা এগিয়ে এসে ভারি কাঠের জানালাগুলো খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক দমকা তাজা বাতাস আর সমুদ্রের গর্জন ভেসে এলো। আমরা চার জন জানালার ধারে ছুটে গেলাম। পাহাড়টা সোজা সমুদ্রের ভেতর নেমে গেছে। সামনে বিশাল সমুদ্র। তারার আলোতে কালো ঢেউগুলো চকচক করছে। বাবু ফিসফিস করে বললো, 'এতো সুন্দর বাড়ির কথা আমি ভাবতেই পারি নি।'

আমি বেশ জোর গলায় ঘোষণা করলাম, 'নেলী খালা, এ ঘরটা আমাদের। মেয়েদের তুমি অন্য ঘরে নিয়ে যাও।'

ললি, টুনি, নেলী খালার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে টুনি আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলো, আমি না দেখার ভান করে বাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'চমৎকার, তাই না বাবু !'

বাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'সিম্পলি মার্ভেলাস।'

ঘরের পাশেই বাথরুম। বেসিন-টেসিন নেই। বড়ো বড়ো বথ-টাবে তোলা পানি। আমাদের ঘরের মেঝেটা ভারি কাঠের, কিন্তু বাথরুমের মেঝে শ্বেতপাথরের। আমরা দু'জন মুখ-হাত ধুয়ে চুল-টুল আঁচড়ে নিচে খাবারের ঘরে গিয়ে দেখি বিরাট এক টেবিল বোঝাই খাবার সামনে নিয়ে নানু আর নেলী খালা বসে আছেন। আমাদের দেখে বললেন, 'ললি টুনি এলো না ? বড়িবি যাও তো, ওদের ডেকে আনো।'

গ্যাস বাতির আলোতে খাবার ঘরটা বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। আমরা দুটো ভারি মেহগনি কাঠের চেয়ার টেনে বসলাম। একটু পরে ললি টুনি এলো। ওরাও জামাকাপড় পাল্টে এসেছে। বাবু টুনির দিকে তাকিয়ে বললো, 'মেয়েদের সব কিছুতেই দেরি।'

নেলী খালা খাবার বেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'মেয়েদের সঙ্গে ওভাবে লাগতে যেও না বাবু। আমিও মেয়েদের দলে।'

বাবু সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আপনি তো আর সাধারণ মেয়ে নন।'

নেলী খালা চোখ দুটো গোল করে বললেন, 'একেবারে অসাধারণ বানিয়ে ফেললে ?'

টুনি বললো, 'আমিও সাধারণ মেয়েদের দলে নই।'

বাবু বললো, 'সেটা এখনো প্রমাণ হয় নি।'

ওদের কাণ্ড দেখে আমি আর ললি একসঙ্গে হেসে ফেললাম। খেতে খেতে নেলী খালা হেসে বললেন, 'হ্যাঁরে আবির, আমার এই বাড়ি কেনা নিয়ে শানুপা চ্যাঁচামেচি করেন নি?'

আমি বললাম, 'করে নি আবার ! বাবাও বললো, তোমার এ কাজটা নাকি ভালো হয় নি।'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'তোর বাবা আবার শানুপার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন কেন ? ওঁকে তো বেশ বুদ্ধিমান বলেই জানতাম। তবে যাই বলিস, আমি যে ঠকি নি, এখন নিশ্চয়ই তোরা বুঝতে পারছিস।'

আস্ত একখানা হাঁসের মাংস মুখে পুরে আমি কোনো রকমে বললাম, 'সে আর বলতে।'

বাবু বললো, 'চমৎকার হয়েছে মাছের কোপ্তাটা।'

আমি খেতে খেতে নেলী খালাকে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বাবুকে আরো দুটো কোপ্তা দাও নেলী খালা।'

নেলী খালা কোপ্তার বাটি বাবুর দিকে ঠেলে দিয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'বাবুর যখন কোনো কিছুর দরকার হয়, তখন ওভাবেই বলে।'

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠলো। বাবুও রাগতে গিয়ে হেসে ফেললো। বললো, 'এটা কোনো কথা হলো ? আমি যদি বলি, ওই ঝাড়বাতিটা চমৎকার, তাহলে আমার পাতে ঝাড়বাতি তুলে দেবে নাকি !' সবাই আরেক দফা হাসলো।

টুনি বললো, 'বলে দেখলেই হয়।'

নানু প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'তবে যাই বলিস নেলী, নিজেদের জন্যে বাড়িটা চমৎকার হলেও এখানে তুই মোটেলে থাকার লোক কোথায় পাবি ? এত দূর কেউ কি এখানে এসে থাকতে চাইবে ?'

নেলী খালা বললেন, 'ওসব আমার হাতে ছেড়ে দাও আব্বু। আমি অলরেডি টুরিস্ট ব্যুরোকে পাঠাবো বলে একটা প্রজেক্টের স্কীম তৈরি করে ফেলেছি।'

সবশেষে পুডিং খেতে খেতে নেলী খালা বললেন, 'তোমাদের সবাইকে আমি কাল সকালে একটা অবাক করা সংবাদ উপহার দেবো। এখন খেয়েই ঘুমোতে যাবে।'

আমরা সবাই হৈচৈ করে উঠলাম— 'তা হবে না নেলী খালা। এখন যদি কিছু না বলো, তাহলে আমাদের ঘুমই হবে না। এতোক্ষণ কেন বলো নি !'

নেলী খালা এ ধরনের আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিলেন না। লাজুক হেসে আমতা আমতা করে বললেন, 'এখনও আমি শিওর নই। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই নুলিয়াছড়ির কোথাও বোধ হয় আমরা একটা সোনার খনি-টনির সন্ধান পেতে পারি। সোনার খনি খুঁজতে গিয়ে তোমাদের ছুটির দিনগুলো বেশি একঘেয়ে মনে হবে না। ব্যাস, এর বেশি কিছু এখন বলবো না। এতে যদি তোমাদের ঘুম হয় তবে আমি রেহাই পাই।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠতে উঠতে বাবু বললো, 'নেলী খালা যা বললেন, এ নিয়ে আলাপ করে সারারাত জেগে কাটিয়ে দেয়া যায়। একবার ভাবো তো— সোনার খনি আবিষ্কার করবো আমরা ! আমার মনে হচ্ছে আমরা ওয়াল্ড ডিজনীর কোনো এ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ডে এসে পড়েছি।'

ললি টুনি আমাদের 'গুড নাইট' বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। টুনিটা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। সোনার খনি আবিষ্কারের উত্তেজনায় ওর ভয় যদি কিছুটা কাটে।

বাবু ঘরে ঢুকে বললো, 'কী করে ছুটি কাটাবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে ছুটিটা আরো লম্বা হলে ভালো হতো।'

ঘরের ভেতর এতো বাতাস যে একটু শীত শীত করছিলো। নেলী খালা অবশ্য বিছানার ওপর কম্বলও রেখে গেছেন। সারা ঘর চাঁদের আলোয় ভরে আছে। কামিনী ফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বাবু যদিও বলছিলো গল্প করে সারারাত কাটিয়ে দেবে, তবু আমরা এতো ক্লান্ত ছিলাম যে বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সোনার খনি আর অতৃপ্ত প্রেতাত্মা

স্ক্যাটরার ঘেউ ঘেউ আর অনেকগুলো হাঁসের প্যাকপ্যাক ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলে দেখি বাবু ততক্ষণে উঠে বসেছে। জানালার বাইরে আলো ঝলমল সমুদ্র। বাবু ফোলা ফোলা চোখে তাকিয়ে নরোম হাসলো। বললো, 'কী মনে হচ্ছে আবির?'

আমিও হেসে বললাম, 'ভূমধ্যসাগরের কোনো জলপাই দ্বীপ।'

মুখ ধুয়ে নিচে এসে দেখি ললি টুনি আগে থেকেই রাশান মাক্রশকা পুতুলের মতো সেজেগুজে বসে আছে। বাবু বললো, 'হা-ই টুনি।'

টুনি ওকে জিব দেখালো। ললি ফিক করে হেসে ফেললো। বাবু ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসলো। নেলী খালা সবার রুটিতে মাখন আর জেলি লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। বাবু বললো, 'নেলী খালা কাল বলেছিলেন না আপনার ঘরগুলো সাজাতে হবে ?'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'তাই বলে এক্ষুনি লেগে যেতে হবে না।'

বাবু বললো, 'মেয়েরা আপনাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে। আমি আর আবির সোনার খনি খুঁজতে যাবো।'

আমি হেসে ফেললাম। ললি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'টুনির মুখ-ভেংচি খেয়ে সব মেয়েদের ওপর ক্ষেপে গেলে দেখছি। আমি তো কিছু করি নি বাবু।'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'তুমি টুনির কান টেনে দেয়ার বদলে হেসেছো।'

টুনি তড়বড় করে বলে উঠলো, 'দেখা যাবে কে কার কান টানে। ললিপা, আমরা আলাদা বেরুবো। বয়েই গেছে ওদের সঙ্গে যেতে।'

নেলী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আজ কাউকেই বেরুতে হবে না। ঘরের কাজ মেয়েরা করবে আর ছেলেরা করবে বাইরের কাজ।' এই বলে নেলী খালা সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি দিলেন—'দোতালার দুটো ঘর গোছাবে ললি, টুনি, আমি দুটো সাইনবোর্ডে রং লাগাবো, আর আবির, বাবু মালীকে গোলাপের বেডে সাহায্য করবে। আমি কিছু বসরাই গোলাপের কাটিং এনে রেখেছি।'

আমি বললাম, 'এখানে বসরাই গোলাপ কোথায় পেলে ?'

নেলী খালা একটু লাজুক হেসে বললেন, 'মেজর জাহেদ আহমেদের বাড়ি থেকে এনেছি। তোমাদের তো বলা হয় নি, এখানে একটা গোপন আর্মি ক্যাম্প আছে। ক'দিন ধরে বর্ডারে স্মাগলিং খুব বেড়ে গেছে। তাছাড়া এ বর্ডারে কয়েকটা কুখ্যাত ডাকাত দল রয়েছে। পুলিস কিছু করতে পারে নি। মেজর জাহেদ এই বেযটার কমান্ডে আছেন। সাবধান, কারো সঙ্গে ওঁর ব্যাপার নিয়ে আলাপ করো না।'

আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ খেলাম। নেলী খালা কেবলই আমাদের ভাবিয়ে তুলছেন। দরজায় গরগর শব্দ হতে চেয়ে দেখি হেলেদুলে বেশ চিন্তিত মুখে স্ক্যাটরা এসে ঘরে ঢুকে নেলী খালার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। নেলী খালা ওর মুখে একটা টোস্ট ধরিয়ে দিলেন। 'সকালে হাঁসদের তাড়া করেছিলো বলে ওকে খুব বকেছি। এখন দেখতে এসেছে আমার রাগ কমেছে কিনা' — এই বলে নেলী খালা ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন —'যাও আর দুষ্টুমি কোরো না।'

স্ক্যাটরা তখন বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা হেসে বাঁচি না। ওর জন্য নেলী খালাকেও বেশ গর্বিত মনে হলো। বললেন, 'স্প্যানিয়েল আর গ্রে হাউন্ডের ক্রস। এতো সস্তায় পেয়েছি যে বলার কথা নয়। কক্সবাজারের মিসেস ডিক্রুজের কাছ থেকে গত বছর মাত্র সাড়ে তিন শ' টাকায় কিনেছি।'

গরম কোকো খেতে খেতে নেলী খালাকে বললাম, 'এবার তোমার সোনার খনির কথা বলো নেলী খালা।'

নেলী খালা লাজুক হাসলেন— 'আমার বলছিস কেন ? তোদের তাহলে খুলেই বলি। আমাদের বাড়ি থেকে দু' ফার্লং দূরে একটা পাহাড়ী নদী আছে। নাম হচ্ছে সোনাবালি নদী। আমি মাঝে মাঝে ওখানে মাছ ধরতে যাই। পানির রং এতো স্বচ্ছ যে, নিচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। মাছ লুকিয়ে থাকতে পারে না। এক দিন লক্ষ্য করলাম বালির রঙগুলো বেশি চকচকে, আর মাঝে মাঝে কেমন যেন সোনালি আভা ছড়াচ্ছে। কিছু বালি তুলে এনে ভালো করে পরিষ্কার করে দেখি, বালিতে সোনার গুঁড়ো রয়েছে। ক'দিন তো বেশ উত্তেজনার ভেতর কাটলো। রোজ কাঠের বারকোশে বালি তুলে পরিষ্কার করি আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সোনার গুঁড়ো বার করি। অবশ্য পরিমাণে খুবই সামান্য। সব মিলিয়ে আমি মাত্র

কয়েক রত্তি সোনা পেয়েছি। তবে মনে হয় এ নদী কোথাও কোনো সোনার খনির পাশ দিয়ে বইছে। আমি পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে আর মিনারেল ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশনকে দুটো চিঠি দিয়েছি। আশা করি দু'-এক দিনের মধ্যে জবাব পেয়ে যাবো।'— এই বলে নেলী খালা মিষ্টি করে হাসলেন —'চিঠির জবাব পেলে সবাই মিলে আমরা সোনার খনি খুঁজবো।'

টুনি বাচ্চাদের মতো হাততালি দিয়ে বললো, 'কী মজা, আমরা তাহলে একটা সোনার খনির মালিক হয়ে যাবো।'

আমি হেসে বললাম, 'ভেবেই সুখ। সোনার খনি পেলে ওটা যে গভমেন্টের হবে, তাও বুঝি জানো না!'

'তাতে কী !' একটু চুপসে গিয়ে টুনি বলল, 'আমরা আবিষ্কার করেছি বলে কয়েক তাল সোনাও পাবো না?'

নেলী খালা বললেন, 'সোনা পাবে কিনা জানি না, তবে খবরের কাগজে আবিষ্কারকদের ছবি উঠতে পারে।'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'সেটা আরো মজার হবে।'

খাবার পর আমরা বাইরে এলাম। নানু লনে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছেন। আমি বললাম, 'নানু, নাস্তা খান নি যে?'

নানু একটু হেসে বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমাকে সব সময় ঘড়ি ধরে খেতে হয়। রাতে তোমাদের ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?'

বাবু বললো, 'রীতিমতো নাক ডেকে ঘুমিয়েছি।'

বাগানে যেতে যেতে আমি বললাম, 'নিজের নাক ডাকা বুঝি শোনা যায় কখনো?'

বাবু বললো, 'তোমারটা শুনে বুঝেছি। আমারও নিশ্চয় ডেকেছিলো।'

'কক্ষনো আমার নাক ডাকে না। আর তোমার ডাকলেও আমি শুনতে পেতাম।'

বাবু হেসে ফেললো— 'আমি তো এমনি বলেছি। চটছো কেন?'

আমিও হাসলাম— 'মনে হয় খুব ফুর্তিতে আছো!'

বাবু অবাক হয়ে বললো, 'কেন, থাকারই তো কথা! তোমার কি ভালো লাগছে না?'

'আমি বুঝি তাই বলেছি? আমি তোমাকে টুনির কথা জিজ্ঞেস করেছি।'

বাবু শুধু বললো, 'চমৎকার!'

আমি বললাম, 'ললিও খুব ভালো মেয়ে। আসলে এরকম মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত।'

বাগানে গিয়ে দেখি বুড়ো মালী বেচারা একগাদা গোলাপের কাটিং নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। আমরা যখন বললাম আমরাও ওর সঙ্গে কাজ করবো, তখন মালী আমাদের হাতে নিড়ানিটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, ' তোমরা দু'দিনের জন্যে এসেছো, তোমরা কেন মিছেমিছি কষ্ট করবে।'

আমি বললাম, 'দু'দিন নয় মালী, দু'মাস।'

'ওই হলো। দু'মাস হলেও তো আমাদের অতিথ বটে।'

আমি আর বাবু সুতো ধরে গোলাপের বেডের জায়গা ঠিক করে নিলাম। সারের গাদা থেকে সারও এনে দিলাম। নেলী খালা দুটো গরু পুষছেন। দুধের সঙ্গে সঙ্গে সারের জন্যেও ভাবতে হয় না। মাটি পরিষ্কার করতে করতে মালী বললো, 'তাও ভালো, দু'মাস থাকবে। বাড়িটা যেন এ্যাদ্দিন মিত্যুপুরী হয়ে ছিলো। যেখানেই যাই, লোকে বলে এটা নাকি ভূতের বাড়ি। আমার বাপু দম আটকে আসছিলো। জেনেশুনে কেউ এমন বাড়ি কেনে!'

আমি বললাম, 'ভূতের বাড়ি কেন বলে মালী?'

ঠোঁট উল্টে খুরপি নেড়ে মালী বললো, 'কি জানি বাপু! লোকে বলে, তাই আমিও বলি। বিবিজির মাথা খারাপ না হলে কক্সবাজারের অমন বাড়িটা বেচে দেয়! বড়ো হুজুরকে কতো বোঝালাম। পাত্তাই দিলেন না। তবে এও তোমাদের বলে রাখি বাপু, কাঙালের কথা বাসি হলে কাজে দেয়।'

বাবু হেসে বললো, 'মনে হচ্ছে এটা সত্যি সত্যি ভূতের বাড়ি হলেই যেন তুমি খুশি হও।'

মালী বিরক্ত হয়ে বললো, তা কেন হবো বাপু! কক্সবাজারের বাড়িটা আরো ভালো ছিলো, তাই বলছি। নইলে আমার কি! কত্তারা যেখানে নেবেন সেখানেই যাবো। বুড়ো বয়েসে মানুষের দোরে ফিরবো নাকি।'

আমি বললাম, 'লোকে কেন এটাকে ভূতের বাড়ি বলে, তুমি কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করো নি?'

মালী আবার হাতের কাজ থামিয়ে খুরপি নেড়ে বললো, 'তা আর করি নি ভেবেছো? হাজার বার করেছি। এই যে ধরোগে হাটের লোকগুলোন। ওরা বলে আগে নাকি এ বাড়িটা লালমুখো হার্মাদদের আড্ডাখানা ছিলো। ওরা নাকি ডাকাতি করে কে ক'টা খুন করলো— মানুষ কেটে মুণ্ডুখানা সঙ্গে নিয়ে আসতো। এ পাহাড়টাকে অনেকে মুণ্ডুখালি পাহাড় বলে। হার্মাদরা সেই মুণ্ডু বস্তায় ভরে পুঁতে রাখতো। আর সেই মুণ্ডু খোঁজার জন্যে তেনাদের আত্মারা এখনো নাকি এ বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে নাকি দেখেছে— পুন্নিমার রাতে সাদা কাপড় পরে নদীর কিনার ধরে হেঁটে হেঁটে সমুদ্দুরে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তেনাদের গা থেকে আলো বেরোয়। এই দেখে তো এই নেই।' হঠাৎ কী মনে পড়াতে মালী ব্যস্ত হয়ে কাজ শুরু করে দিলো, 'আমি বাপু তোমাদের এসব কথা বলি নি। বিবিজি জানতে চাইলে বোলো হাটের লোকগুলোন বলেছে। আর এও বলি বাপু, জঙ্গলে যদি কখনো যাও, তাহলে মড়ার খুলি আঁকা কোনো গাছের নিচে যেয়ো না।'

বাবু বললো, 'জঙ্গলে আবার মড়ার খুলি আঁকা গাছও আছে নাকি?'

'নেই আবার!' মালী উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমি নিজ চোখে দেখেছি। বিবিজির যখন নদীর কাদামাটি ঘাঁটার বাই উঠলো, তখন তো আমিই সঙ্গে যেতাম। একদিন দেখি পুরোনো এক সেগুন গাছের গায়ে কিসের যেন আঁকিবুকি। কাছে গিয়ে দেখি মড়ার মাথার খুলি আঁকা। চারপাশে তাকিয়ে দেখি মাটির ভেতর থেকে একটি খুলি আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি তখন দোয়া পড়তে পড়তে কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচি। বাথিনও আমাকে ওসব গাছের কাছে যেতে বারণ করেছে।'

আমি বললাম, 'তুমি তো বড়ো ভাবিয়ে তুললে মালী!'

বিচক্ষণ লোকের মতো মাথা নেড়ে মালী বললো, 'ভাববার কথাই বটে। বিবিজিকেও বলেছি। তিনি তো কানেই তোলেন না। বলেন, কোনো পাজি লোক ওসব করেছে। আমি বাপু এ তল্লাটে কোনো পাজি লোক দেখি নি। হাটের লোকগুলোন দেখা হলেই সুখ-দুঃখের খবর নেয়, বাড়ির অবস্থা-টবস্থা জিজ্ঞেস করে। কবে থেকে মোটেল খুলবো জানতে চায়। বলে— শহরে গেলে ওরা বলবে, এখানে ভালো মোটেল আছে।'

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, 'তবে এটাও বলে যে বাড়িটা ভালো নয়, ভূতের আড্ডা এটা। এখানে থাকা উচিত নয়। তাই না মালী?'

মালী বুঝলো, কথাটা আমি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছি। তাই বিরক্ত হয়ে বললো, 'ভালো লোক বলেই সাবধান করে দেয়। নইলে ওদের কী দায় পড়েছে? এই তো সেদিন পাকড়াশীদের চাকরটা আমাকে এক গণ্ডা সাদা পাতা দিয়ে বললো, 'এখানে তেনাদের যা দৌরাত্ম্য, ওর নাকি মন টিকছে না। ও নিজ চোখে দেখেছে। বলে, মাইনেটা পেলেই কেটে পড়তো। নেহাৎ মনিবটি এতো ভালো বলে থেকে গেছে।'

বাবু বললো, 'পাকড়াশীটা আবার কে?'

মালী বললো, 'নিকুঞ্জ পাকড়াশী। হাটের পুব দিকে ওনার একটা পাহাড় আছে। ওখানেই থাকেন। ভারি দয়ার শরীল গো। এখানে নতুন এসে ওনার সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম— আমাকে দশ টাকা বকশিশ দিলেন। আরো কতো খোঁজখবর নিলেন। এতো পয়সা ওনার, একটুও দেমাক নেই। ধরতে গেলে একেবারে মাটির মানুষ।'

বাবু হঠাৎ আমার কানে কানে বললো, ' নেলী খালা যে সোনা খুঁজতেন, মালী কি সেটা জানে না? ও যে বললো, কাদামাটি ঘাঁটতেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মালীকে বললাম, 'জানো মালী, নেলী খালা বলেছেন, তোমাদের এই নদীটার কোথাও নাকি সোনার খনি আছে। নদীর বালিতে সোনা পাওয়া যায়।'

মালী ঠোঁট উল্টে বললো, 'বিবিজি কথাটা আমাকেও বলেছিলেন। এ আমার পেত্যয় হয় নি। আমি পাকড়াশী বাবুকে বলেছিলাম বটে। শুনে তিনি হেসে বাঁচেন না। বললেন, 'তাহলে তো তোমরা কোটিপতি হয়ে গেলে হে। এখন থেকে দেখি বুঝে-সমঝে কথা বলতে হবে।' আমি তখন লজ্জায় মরি আর কি।'

আমি বললাম, 'নেলী খালা যে কিছু সোনা পেয়েছেন, তুমি দেখো নি?'

মালী বললো, 'তোমাদের বুড়িগঙ্গার নদ্দমাতেও কাদা ঘেঁটে ওরকম সোনা পেতে আমি দেখেছি। সেটাকে তো আর খনি পাওয়া বলে না।'

বাগানে কাজ করতে করতে দিনের আলোয় বাড়িটাকে ভালো করে দেখলাম। কাঠামো দেখে মনে হয় কয়েক শ বছরের পুরোনো হবে। নেলী খালা যাদের কাছ থেকে কিনেছেন, অর্থাৎ তালুকদাররা নাকি কয়েক পুরুষ ধরে এ বাড়িতে থেকেছেন। যত্ন নিয়েছেন যে বোঝা যায়। কবেকার লাগানো সারি বাঁধা কৃষ্ণচূড়া, আর রাধাচূড়ার গাছগুলো লাল আর হলদে ফুলে ফুলে রঙের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। গাছের তলায়, পথের ওপর সোনার গুঁড়োর মতো রাধাচূড়া ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চমৎকার নকশা এঁকেছে। তালুকদারদের পূর্বপুরুষের রুচির প্রশংসা করতে হয়। পয়সাও যথেষ্ট ছিলো বলতে হবে। নইলে এতো বড়ো বাড়ির — বাড়ির না বলে প্রাসাদই বলা উচিত; যত্ন করা চাট্টিখানি কথা নয়। আশেপাশের পাহাড়গুলো থেকে এ পাহাড়টাই বেশি উঁচু। পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো বর্ডার পেরিয়ে বার্মায় গিয়ে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে কিছু দূর পাহাড়, তারপর সমুদ্র আর পশ্চিমে শুধু সমুদ্র। সারাক্ষণ সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এমন বাড়িকে ঘিরে যদি রহস্যের পাহাড় না জমে, তবে কি আমাদের রূপলাল লেনের এঁদো গলির ঘিঞ্জি বাড়িটা রহস্যময় হবে? এ বাড়ি হার্মাদদের আড্ডা হতে পারে। এ বাড়ির চারপাশে অসংখ্য অতৃপ্ত আত্মা অষ্টপ্রহর ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়াতে পারে। এ পাহাড়টায় হার্মাদদের পুঁতে রাখা কঙ্কাল থাকতে পারে। এমনও তো হতে পারে, সোনার খনি খুঁজতে গিয়ে আমরা হার্মাদদের এক বিশাল গুপ্তধন পেয়ে গেলাম— চিলেকোঠায় বসে অলস দুপুরগুলোতে আমি যার স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতে ভাবতে আমার লোম-টোম সব খাড়া হয়ে গেলো। বাবুকে বললাম, 'চলো, বাকিটুকু মালী সারতে পারবে। আমরা আরো বড়ো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবো।'

বাবু হাত ঝেড়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'সোনার খনির ব্যাপারে তুমি কি খুব সিরিয়াস?'

আমি বললাম, 'শুধু সোনার খনি নয়, আরো অনেক কিছু নিয়ে আমি ভাবছি। দুপুরের পর ললি টুনিকে নিয়ে আমরা একটা প্ল্যান করবো।'

আমাদের আসতে দেখে নেলী খালা ডাকলেন, 'আবির, বাবু, দেখে যাও। আমার সাইনবোর্ড তৈরি হয়ে গেছে।'

এরই মধ্যে হয়ে গেলো! আমরা দু'জন থামঅলা গেটের কাছে ছুটে গেলাম। চমৎকার লিখেছেন নেলী খালা —

সী ভিউ প্যালেস
অবকাশ যাপনের একটি
মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের স্কুলে ক্যান্ডি লেটারিং শিখিয়েছিলেন ব্রাদার হবার্ট। নেলী খালা 'সী ভিউ প্যালেস'টা ক্যান্ডি হরফে লিখেছেন। বাংলায় যে ক্যান্ডি লেখা হতে পারে, আর সেটা এতো সুন্দরভাবে— আমার ধারণাই ছিলো না। আমি হেসে বললাম, ' তোমার এতো সুন্দর প্রশংসা করার লোক খুব কমই পাবে।'

নেলী খালা লাজুক হেসে বললেন, 'তুমি বুঝি সেই কমের দলে! আমার এখানে সব গেঁয়ো লোকেরা আসবে, এটা ভাবছো কেন আবির?'

বাবু বললো, 'বরং শহরের সৌখিন লোকেরাই শুধু এখানে থাকতে চাইবে। কী বলেন নেলী খালা?'

নেলী খালা তেমনি হেসে বললেন, 'তোমাদের মতো সৌখিন ফুলবাবুরা।' প্রশংসা শুনলে নেলী খালা লাল হয়ে যান।

আমি বললাম, ' মোটেই আমরা ফুলবাবু নই। বাগানে গিয়ে দেখো গে কতো কাজ করেছি আমরা।'

নেলী খালা আদর করে আমাদের কপালে চুমো খেয়ে বললেন, 'এবার তাহলে নাইতে যাও। বাথিন টবে পানি তুলে রেখেছে।'

দুপুরে খাবার পর বাবু ললি টুনিকে ডেকে বললো, 'আমরা দারুণ একটা কাজে হাত দিতে চাই। তোমরা যদি যোগ দিতে চাও, তাহলে আমাদের ঘরে চলে এসো।'

ললি আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'ঘরে চলো, সব খুলে বলবো।'

ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। আমার মনে হলো, জীবনে এই প্রথম একটা রোমাঞ্চকর কাজে হাত দিতে যাচ্ছি। সেগুন কাঠের পালিশ করা মেঝের ওপর আমরা চার জন বসলাম। ওদের মুখের দিকে তাকালাম। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে টুনি। আমি গলাটা ঝেড়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বললাম, 'তোমরা কি কেউ এ বাড়ির অভিশাপটা নিয়ে ভেবেছো?

বাবু ললি টুনির দিকে তাকালো। টুনি ঢোক গিলে বললো, 'আমার মনে হয় এখানে ভূত-টুত থাকতে পারে।'

'ওসব বাজে কথা।' আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ভূত বলে কিছু নেই।'

টুনি বললো, 'তবে যে বুড়ো মুৎসুদ্দি বললো, এটা ভূতুড়ে বাড়ি?'

বাবু বললো, 'মুৎসুদ্দি তো ভালোই বলেছে। মালীটা যা বললো, তার ছটাকও যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এর পেছনে বিরাট রহস্য আছে কোথাও।'

ললি অবাক হয়ে বললো, 'মালী কী বলেছে?'

মালীর সব কথা ললি টুনিকে খুলে বললাম। শুনে ললি টুনি অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালো। ললি বললো, 'কী আশ্চর্য, ঠিক এ কথাগুলোই যে বাথিন আমাদের বলেছে। ওকে নিয়ে যখন আমরা ঘর সাজাচ্ছিলাম, তখন এসব বললো। কাউকে বলতেও বারণ করেছে।'

এবার আমার আর বাবুর অবাক হবার পালা। আমার মনে হলো, এমন তো হতে পারে যে, দু'জনেই হাট থেকে এসব কথা শুনেছে। এ্যাদ্দিন বলার মতো কাউকে পাচ্ছিলো না। এখন পেয়ে সব কথা হুড়মুড় করে বলে ফেলছে। আমি কী বলবো, মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, 'দেখো, এসব কথার ভেতর থেকে একটা ব্যাপারই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে আমাদের থাকাটা কেউ পছন্দ করছে না, সেজন্যে ভয় দেখিয়ে তালুকদারদের মতো তাড়িয়ে দিতে চাইছে। নেলী খালা বললেন, তালুকদাররা

নাকি ভূতের ভয়ে কেটে পড়েছে। এর দুটো কারণ আমার মনে হয়েছে। এক হলো, নেলী খালার কথা মতো এখানে কোনো সোনার খনি আছে। হয়তো সেটা এই পাহাড়েই হতে পারে। কারো হয়তো ইচ্ছে আছে আমরা সবাই নেলী খালারা সুদ্ধো যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, তাহলে মনের সুখে লুকিয়ে লুকিয়ে সোনা তুলতে পারবে। আরেকটা হতে পারে'— বলে আমি একটু ঢোক গিলে বললাম, 'ওরা যখন বলছে, আগে এটা হার্মাদদের আস্তানা ছিলো, তখন এখানে কোথাও মাটির নিচে লুকোনো গুপ্তধন থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। হয়তো এ বাড়ির কোথাও একখানা নকশা লুকোনো আছে। সেই গুপ্তধনের লোভে কেউ চাইছে, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। আর সেজন্যেই এসব আত্মা আর ভূতের আজগুবি গপ্পো ছড়াচ্ছে।'

টুনি বললো, 'তবে যে বাথিন বললো, মড়ার খুলি আঁকা গাছের নিচে এখনো মানুষের হাড়গোড় পাওয়া যায়।'

আমি বললাম, ' সেটা আরো সন্দেহের ব্যাপার। এখানে স্মাগলার আছে, সে কথা তো নেলী খালাই বললেন। ওদের ভেতর তো ডাকাতও থাকতে পারে, যারা এখনো মানুষ খুন করে মাটির নিচে পুঁতে রাখে।'

আমার কথা শুনে টুনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আপনি মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছেন কেন? বাথিন বলেছে হার্মাদরা খুন করতো।'

বাবু বিরক্ত হয়ে বললো, 'আহ টুনি, নাকীকান্নার সময় নয় এটা। হাড়গুলো কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করালেই বোঝা যাবে ওগুলো কবে পুঁতেছিলো। তবে আবির মনে হয় একটু বেশি ভেবে ফেলেছে।

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'তোমার কি সত্যিই মনে হয় আবির, এখানে কোনো গুপ্তধন লুকোনো আছে?'

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'কথাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি অনেক বইয়ে পড়েছি, এরকম বাড়িতেই গুপ্তধন থাকে। গুপ্তধন না পেলেও লুকোনো এমন কোনো জিনিস তো আমরা পেতে পারি, যা জাদুঘরঅলারা লুফে নেবে।

ললি গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে সায় জানালো। বললো, 'কাজ কীভাবে শুরু করতে চাও?'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে।'

ললি বললো, 'আজ সকালে পাশের ঘরগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক জিনিসপত্র দেখেছি। থালা, বাসন, ফুলদানি, ঝাড়বাতি এসব। আমার মনে হয় নকশা-টকশার জন্যে আমরা সবগুলো ঘর খুঁজে দেখতে পারি। এখনো বেশিরভাগ ঘরেরই তালা খোলা হয় নি।'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'ললিপা বুঝি এই সুযোগে ওদেরকে দিয়ে ঘরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিতে চাইছো!'

এবার ললি টুনিকে ধমক লাগালো— 'হাসির কী হলো টুনি! দেখছো না, একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলছি? এরপর তাহলে আমাদের কথার সময় তোমাকে ডাকা হবে না।'

বোঝা গেলো আমার আইডিয়াটা ললির খুব পছন্দ হয়েছে। টুনি অবশ্য গাঁইগুঁই করে বলতে লাগলো, 'গুরুতর না ঘোড়ার ডিম। ওরা প্ল্যান করে আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে।'

বাবু বললো, 'তুমি তাহলে কেটে পড়তে পারো। শোনো আবির, ডাকাত যদি থেকে থাকে, তাহলে আমাদের আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে জানানো উচিত। নেলী খালা তো বললেন ওরা নাকি নতুন এসেছে, এসব নাও জানতে পারে। মেজরের সঙ্গে মনে হয় নেলী খালার ভালোই আলাপ আছে। আমাদের অসুবিধে হবে না।'

ললি মাথা নেড়ে জানালো— 'কথাটা মন্দ বলো নি বাবু। তবে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি এসব কথা নেলী খালাকে বলবেন, আর শেষে সবাই মিলে হাসাহাসি করবে। বড়োরা কখনো আমাদের প্ল্যান মতো কাজ করবে না।'

আমি বললাম, 'প্ল্যানের কথা মেজরকে না বললেই হয়। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবো। সেই সঙ্গে হাটের লোকজনকে একটু বাজিয়ে দেখা যাবে। আমার তো মনে হয় শত্রু পক্ষের কোনো চর নিশ্চয় হাট থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

'শত্রু পক্ষের' কথাটা শুনে ভেবেছিলাম টুনি হেসে ফেলবে। কিন্তু দেখলাম, টুনিও বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শুনলো।

রহস্যময় অতিথি

দুপুরের পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় আমরা আলোচনার জন্যে খরচ করেছিলাম। শেষে বাবু যখন হাই তুলে বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে'— তখন ললি টুনি ওদের ঘরে চলে গেলো। বাবু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি খাটের গায়ে হেলান দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে চলে গেলাম।

নেলী খালা কখন যে চুপি চুপি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, টেরও পাই নি। আমার কাঁধে আলতোভাবে হাত রেখে বললেন, 'কিরে, বাবু ঘুমাচ্ছে, তুই যে জেগে আছিস?'

আমি একটু চমকে উঠে নেলী খালাকে দেখলাম। সাদা শাড়ি পরা নেলী খালাকে মার মতো পবিত্র মনে হলো। নেলী খালা আস্তে খাটের উপর বসলেন, যেন বাবুর ঘুম না ভাঙে। তারপর কোমল গলায় বললেন, 'হ্যাঁরে, অপুর কোনো খবর পেয়েছিস?'

আমি গত মাসে পাওয়া চিঠির কথা বললাম। নেলী খালা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'কক্সবাজারে একদিন অপুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, ' সে কি নেলী খালা! তুমি ভাইয়াকে চিনলে কী করে?'

নেলী খালা আগের মতো হেসে বললেন, 'বোকা ছেলে! চিনবো না কেন? অপু যে বার ম্যাট্রিক দিলো, সেবার যে আমি তিন দিনের জন্যে তোদের বাড়িতে এসেছিলাম, ভুলে গেছিস নাকি?'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'ভাইয়ার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে নেলী খালা? ভাইয়া কী করছে এখন?'

নেলী খালা শান্ত গলায় বললেন, 'অনেক কথা হয়েছে। তোর মাকে অবশ্য চিঠিতে কিছুই লিখি নি। ওর রঙটা শুধু কালো হয়ে গেছে। শরীর আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। কী

করছে, সব কথা তো আর তোকে বলা যাবে না। এটুকু জানলেই চলবে, অপু দেশের জন্যে কাজ করছে। ওর জন্যে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।'

নেলী খালা আমাকে এখনো ছোট্ট ছেলে ভাবেন বলে দুঃখ পেলাম। বললাম, জানো নেলী খালা, আমারও ইচ্ছে হয় ভাইয়ার মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। ভাইয়ার সঙ্গে কখনো দেখা হলে আমি বলবো, আমাকে যেন সাথে নেয়।'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'পাগল ছেলে, তুই এখনো একেবারে ছোট্টটি রয়ে গেছিস। অপুর মতো হতে চাইলে তোকে অনেক পড়াশোনা করতে হবে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ভাইয়াকে দারুণ স্বার্থপর মনে হলো। কী হতো আমাকে সব কথা বললে! নেলী খালাকে যে-কথা বলা যায়, সে-কথা কি আমাকে বলা যায় না?

দূরে কয়েকটা সমুদ্রের পাখি ডাকছিলো। নেলী খালা কান পেতে সেই ডাক শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'কাউকে বলিস না আবির। অপুর কথাতেই আমি তো এই বাড়িটা কিনেছি। ও বলেছে মাঝে মাঝে ওর বন্ধুরা এসে থাকবে। আমি তো সারা জীবন দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'সত্যি বলছো নেলী খালা! তাহলে ভাইয়ার সঙ্গে নিশ্চয় এখানে দেখা হতে পারে?'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'হতে পারে। আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো প্রায় দেড় মাস আগে। তবে ও বলেছে, এলে খবর দিয়ে আসবে। এখানে এসেই আমি জাহেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছি। দেখ না, ওকেও ঠিক দলে ভিড়িয়ে ফেলবো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, ' সে কি নেলী খালা, তুমিও কি ভাইয়াদের দলে আছো নাকি?'

নেলী খালা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব কথা কখনো তোর বন্ধুদের বলবি না। বাবু ললি টুনিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তোর আর কোনো কাজ নেই। অপুর কথা তোর মার সঙ্গে দেখা হলে বলবো।'

নেলী খালা উঠে চলে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এক দিন ঠিকই ভাইয়ার মতো ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে যাবো। ভাইয়ার আলমারির বাংলা বইগুলো পড়ে শেষ করতে নিশ্চয়ই বেশি দিন লাগবে না।

বিকেলে আমরা লনে গিয়ে কিছুক্ষণ 'পাজি রাজা' খেললাম। টসে বাবু রাজা হয়ে ভালো রকম নাকানি-চোবানি খেলো। খেলতে গিয়ে স্ক্যাটরার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেলো। টেনিস বলটা দূরে গড়িয়ে গেলে স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে ওটা মুখে করে তুলে আনছিলো। কাছে এসে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। নেলী খালা বললেন, 'ক'দিন ওর সঙ্গে আমি খেলার সময় পাই নি বলে বেচারার ভারি মন খারাপ করেছিলো।'

খেলার পর নেলী খালাকে বললাম, 'আমরা চারপাশে একটু ঘুরে দেখবো নেলী খালা। তুমি যে আর্মি ক্যাম্পের কথা বললে, ওটা কোনদিকে?'

নেলী খালা বললেন, 'হাট থেকে সরু যে-রাস্তাটা ডানদিকে নেমে গেছে, সেই রাস্তা ধরে কিছু দূরে গেলেই বাঁ পাশে দেখতে পাবে। হাটে গিয়ে আবার আর্মি ক্যাম্প কোন দিকে বলে গলাবাজি কোরো না।'

বাবু বললো, 'আমাদের অতো বোকা ভাবছেন কেন?'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'যেখানে যাও, রাত কোরো না। আর জাহেদকে বোলো ওদের ওখানে যদি কোনো কাঠের মিস্ত্রি থাকে, কাল সকালে যেন পাঠিয়ে দেয়।'

টুনি বললো, 'জাহেদ কে নেলী খালা?'

একটু অবাক হয়ে নেলী খালা বললেন, ' কেন, মেজর জাহেদের কথা বলি নি তোমাদের? কোন ক্যাম্পে যাচ্ছো তাহলে?

বাবু বললো, 'সেখানেই যাবো নেলী খালা।' তারপর টুনির দিকে তাকালো— 'কাল রাতে খাবার টেবিলে টুনি কানে কুলুপ এঁটে বসেছিলো।'

টুনি চটে গিয়ে আমাকে বললো, 'আবির, আপনার বন্ধুকে বলুন সব সময় যেন আমার পেছনে লাগতে না আসে। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

বাবু বললো, 'খারাপ হলেই বাঁচি।'

টুনি ওকে মারার জন্যে ছুটে এলো। বাবু তার আগেই ছুটলো। ওদের দু'জনের পেছনে স্ক্যাটরাও ছুটলো। আমি আর ললি পাহাড়ী পথ বেয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

ললিটা সব সময় বড়ো বেশি গম্ভীর থাকে। আমি চাই, ললি অন্তত আমার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলুক। এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, ললি আমার এক জন ভালো বন্ধু হবে। বাবু জানলে হয়তো মন খারাপ করতে পারে। ও টুনির সঙ্গে ভাব জমাক না; আমি কিছু মনে করবো না।

আমি এক সময় বললাম, 'তুমি এতো গম্ভীর থাকো কেন ললি? কথাটথা বলো।'

ললি একটু হেসে বললো, 'মাঝে মাঝে তুমিও তো আমার চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে যাও। মনে হয় অনেক কিছু যেন ভাবো।'

আমি বড়দের মতো বিষণ্ন গলায় বললাম, 'নিজেকে কখনো খুব একা মনে হয় ললি। তখন হয়তো চুপচাপ থাকি।'

ললি বললো, 'একা কেন মনে হবে? বাবু আছে তো!'

'বাবু তো দু'মাস পরেই চলে যাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পর ললি আস্তে আস্তে বললো, 'আমাকে এখন থেকে তোমার বন্ধু ভেবো। তাহলে আর একা মনে হবে না।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আমি ভাবলে তো আর হবে না। তোমাকেও ভাবতে হবে।'

ললি একটু লজ্জা পেলো। তারপর বললো, 'যখন নেলী খালার কাছে তোমার সব কথা শুনেছি, তখন থেকেই তোমাকে আমি বন্ধু ভেবেছি।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে ললি বললো, 'আসলে আমি তোমার চেয়েও বেশি একা। টুনি ছাড়া কেউ আমাকে ভালোবাসে না।'

এর পর আমি চুপ করে রইলাম। বুকের ভেতর কেমন যেন শিরশির করে উঠলো। ললির কাঁধে হাত রাখলাম। ও কোনো কথা বললো না। সামনের মোড়টা পেরোতে দেখি, বাবু আর টুনি স্ক্যাটরাকে নিয়ে পথের পাশে ঘাসের ওপর বসে আছে।

টুনি বললো, 'এতো আস্তে হাঁটছো কেন তোমরা? যেতে যেতেই তো সন্ধে হয়ে যাবে।'

ললি বললো, 'তুমি তো জানো টুনি, ডাক্তার আমাকে জোরে হাঁটতে বারণ করেছেন।'

আমি অবাক হলাম— 'কেন ললি?'

ললি খুব আস্তে করে বললো, 'আমার বুকের ভেতর একটা অসুখ আছে।'

আমি ললির মুখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, ওর বুকের ভেতর অনেক দুঃখ জমে আছে। অনেক দিন ধরে যে দুঃখগুলো জমে জমে অসুখ হয়ে গেছে। কাউকে যন্ত্রণা পেতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। মনে মনে ভাবলাম, বড় হয়ে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবো, তখন সবার দুঃখ দূর করে দেবো।

পাহাড়ের বিকেলগুলো যে এতো সুন্দর হয়, আগে আমি ভাবতেই পারি নি। সমুদ্রের বাতাসে পথের ওপর ঝুরঝুর করে রাধাচূড়ার হলদে পাপড়ির বৃষ্টি ঝরছে। দূরের পাহাড়গুলো

লাল, গোলাপি, বেগুনি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। পুরোনো ঢাকার এক সরু গলির কথা মনে পড়লো। সেখানে কোনো দিন এতো বড়ো আকাশ দেখি নি।

আমরা হাটে এসে দেখি দোকানপাট সব বন্ধ। বাবু বললো, 'আজ বোধ হয় হাটবার নয়। গ্রামে শুনেছি হপ্তায় এক দিন নয় দু'দিন হাটের দোকান খোলা থাকে।'

আমি বললাম, 'কাজ নেই হাটে। চলো ক্যাম্পে যাওয়া যাক।'

নেলী খালার কথা মতো ডান পাশের সরু রাস্তায় মোড় ঘুরতেই দেখি একটা বন্ধ দোকানের চালের নিচে লরেল হার্ডির মতো দু'জন ভদ্রলোক একটা বেঞ্চে বসে আছে। সিনেমার লরেল হার্ডির কথা বললাম বটে, তবে ওদের প্যান্ট-শার্ট পরা দেখে যাত্রা দলের সং-এর মতো মনে হচ্ছিলো। কাছে যেতেই মোটা লোকটা আমাকে মোলায়েম গলায় বললো, 'এই যে খোকা, এদিকে শুনলাম একটা মোটেল নাকি আছে। কোন এক বিলেতি মেম চালান ওটা? কোন পথে যাবো বলতে পারো?'

লোকটা আমাকে ললি টুনির সামনে খোকা বলাতে যেমন রাগ হলো, আবার নেলী খালাকে বিলেতি মেম বলাতে হাসিও পেলো। এরই ভেতর টুনি ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করেছে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এ পথ ধরে সোজা চলে যান।'

স্ক্যাটরা ওদের দিকে ভয়ানক সন্দেহের চোখে তাকিয়ে গরগর করছিলো। লরেলের মতো সরু লোকটা দেখতে পেয়ে মিহি গলায় বললো, 'কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো! কুত্তোটা সামলে রেখো বাপু।' এই বলে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে সঙ্গীকে বললো, 'চল ফতে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই প্রাণীটাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। ওরাও আমাকে পছন্দ করে না।'

লোক দুটো চোখের আড়ালে যেতেই আমরা সবাই হেসে কুটোপাটি। স্ক্যাটরাকে মোটেলে দেখলে ওদের যে কী অবস্থা হবে, বিশেষ করে ওই রোগা লিকপিকে লোকটার— যতোবার ভাবলাম ততোবারই শুধু হাসি পেলো। ললি বললো, 'নেলী খালার প্রথম গেস্ট হিসেবে রীতিমতো মনে রাখার মতো।'

নেলী খালা বলেছিলেন আর্মি ক্যাম্প, কিন্তু আমরা কোনো ক্যাম্প অর্থাৎ তাঁবু-টাবু দেখতে পেলাম না। তার বদলে সেখানে রয়েছে চমৎকার এক বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। আর পেছনে টালির ছাদঅলা একটা লম্বা ঘর। বোঝা গেলো এটাকেই নেলী খালা ক্যাম্প বলেছেন। গেটের কাছে দারোয়ানের মতো একটা লোক ঘুরঘুর করছিলো। ওকে গিয়ে বললাম, 'মেজর জাহেদ আহমেদ কি এখানে থাকেন?'

কথাটা শুনে লোকটা খেঁকিয়ে উঠলো— 'এখানে আবার মেজর আসবে কোত্থেকে। আমাদের সায়েব রবারের চাষ করেন আর শিকার করেন।'

লোকটা হয়তো আমাদের তাড়িয়েই দিতো। কিন্তু স্ক্যাটরা ওর দিকে যেভাবে গরগর করছিলো, তাতে সাহস পেলো না। তার বদলে আমার দিকে এমন কটমট করে তাকালো যে, মনে হলো আমরা বিদেয় হলেই সে খুশি হয়। এমন সময় বাংলোর বারান্দা থেকে এক জন ভদ্রলোক নেমে এসে— 'কী হয়েছে বনমালী' বলে আমাদের দিকে তাকিয়েই— 'আরে এসো এসো, আমার ক্ষুদে প্রতিবেশীরা। নেলীর কাছে তোমাদের কথা শুনে শুনে সবার চেহারা পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেছে।'

এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'তুমি হচ্ছো আবির। আর এ হচ্ছে আমেরিকান বাবু'— তারপর ললির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শান্ত মেয়েটি যে ললি, সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। বাকি থাকলো শুধু টুনি। জিব না দেখলেও ওকে চেনা যায়।'

টুনি ওর অভ্যেস মতো ফিক করে হেসে ফেললো। মেজর জাহেদের মতো চমৎকার চেহারার ভদ্রলোক আমি শুধু টিভির বিদেশী ছবিগুলোতেই দেখেছি। টুনিও দেখলাম হাঁ করে

তাঁকে দেখছে। স্ক্যাটরার সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় ছিলো। 'স্ক্যাটরা'— বলে নরোম গলায় যখন তিনি ডাকলেন, তখন স্ক্যাটরা তাঁর সাদা ট্রাউজার আর নীল গেঞ্জিতে ধুলোটুলো মাখিয়ে নাক-মুখ সব চেটে একাকার করে ফেললো। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওরে থাম থাম। সুড়সুড়ি আর আদরের বহরে হাসতে হাসতে আমার দমটা বেরিয়ে যাবে।' তারপর আমাদের বললেন, 'চলো ঘরে যাই।'

মেজর জাহেদ বাবুর্চিকে মিল্ক চকোলেট বানাতে বলে সবাইকে একগাদা ক্যান্ডি বের করে দিলেন। স্ক্যাটরাও বাদ পড়লো না। আমরা সবাই বাংলোর বারান্দায় বসে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিলাম। বড়ো বড়ো কাপে করে গরম মিল্ক চকোলেট না আসা পর্যন্ত কে কি করি, তার ফিরিস্তি দিতে দিতেই সময় কেটে গেলো। এখানে আসার পর কী ঘটেছে তাও বললাম। বাবু আর টুনিই বেশি কথা বলছিলো। তিনি শুধু মিটিমিটি হাসছিলেন।

আমরা চকোলেটের কাপে চুমুক দেবার জন্যে যখন কথা থামালাম, তখন বনমালী নামের সেই খিটখিটে লোকটা এসে মেজরের কানে কানে কি যেন বললো। মেজর শুধু একটু হেসে ওকে ইশারায় চলে যেতে বললেন। টুনি বললো, 'আপনার এ লোকটাকে আমার একদম পছন্দ হয় নি।'

মেজর হেসে বললেন, 'ও নিশ্চয়ই বলেছে, মেজর জাহেদ আহমেদ বলে এখানে কেউ থাকে না। নেলী কি তোমাদের বলে নি, আমরা সবাই এখানে গোপনে ছদ্মবেশে আছি? এখানে যিনি থাকেন—'

তাঁকে বাধা দিয়ে হেসে ফেলে আমি বললাম, 'তিনি শধু রবারের চাষ করেন, আর মাঝে মাঝে শিকার-টিকারে বেরোন।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। স্ক্যাটরা কী বুঝলো কে জানে, ছুটে গিয়ে আরেক দফা মেজরের গাল-টাল চেটে দিলো। মেজর বললেন, 'শিকারের জন্যে এসেছি বটে, তবে এই এলাকায় তেমন সুবিধে করতে পারছি না। শিকারগুলো বড্ডো বেশি বেরসিক। সব সময় নাগালের বাইরে চলাফেরা করে।'

তারপর মেজর বললেন, 'এ অঞ্চলে যে একটা বড়ো রকমের স্মাগলারের দল কাজ করছে, সে রিপোর্ট আমাদের আছে। বর্ডারে সব রকম কড়াকড়ি করা হয়েছে। কিন্তু বার বার পাখি ঠিকই উড়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নেলী খালা বলছিলেন, এখানে নাকি সোনার খনি থাকতে পারে। আপনার কি মনে হয় কোনো পাজি লোক সোনার খনি খোঁজার জন্যে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে?'

মেজর একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, ' সোনার খনির ব্যাপারে আমার সে রকম ধারণা নেই। নেলী অবশ্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসে চিঠি পাঠিয়েছে। সোনার খনি এখানে না হলে বার্মাতেও হতে পারে। তবে আমার মনে হয়, কেউ হয়তো নেলীর বাড়িটা সস্তায় কিনে নিতে চায়। সে জন্যে হয়তো ভয় দেখাচ্ছে। আসল কথা হলো, তোমাদের বোধ হয় এখানকার কেউ পছন্দ করছে না। আমি নেলীকে বলেছি, আমরা যতক্ষণ আছি ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের এখানে এক কোম্পানি সৈন্য আছে— আপাতত যারা রবারের চাষ করছে।' এই বলে মেজর মুখ টিপে হাসলেন।

বাইরে তখন সন্ধে ঘনিয়ে আসছিলো। সূর্যটা অনেক আগেই সামনের পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। ঠাণ্ডা তাজা বাতাস বইছে। বাংলোর ঝুল বারান্দার থাম বেয়ে দুটো লতা গোলাপের ঝাড় ওপরে উঠে গেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছ দুটো। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। ললি বললো, 'এ জায়গাটা ভারি সুন্দর!'

মেজর একটু হেসে বললেন, 'হুঁ, সুন্দরের ভেতরই অসুন্দর বাসা বাঁধে।'

হঠাৎ মনে পড়লো, মেজরকে নেলী খালার কাজের কথা বলা হয় নি। বলতেই তিনি হেসে উঠলেন— 'কাঠের মিস্ত্রি এখানে কোথায় পাবো? নেলীর যদি খুব দরকার হয়, আমার পুরোনো বিদ্যে কিছু জাহির করতে পারি। ওকে বলো আমি কাল সকালে যাবো।'

সন্ধের আগে ফিরে যেতে হবে। মেজরকে বললাম, 'আমরা চলি তাহলে। কাল সকালে দেখা হবে।'

তিনি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আড়চোখে বনমালীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখের সেই খিটখিটে ভাবটা আর নেই। স্ক্যাটরা অবশ্য ওকে দেখে গরগর করে যেন বললো, 'তোমাকে বাপু পছন্দ হয় নি। আমাকে কখনো ঘাঁটাতে এসো না।'

পথের পাশে একটা ঝোপের ভেতর বুনো লিলি ফুটেছিলো। মিষ্টি হলেও গন্ধটা ভারি ঝাঁঝালো। টুনি ললিকে বললো, 'ললিপা এসো, নেলী খালার জন্যে কিছু ফুল নিয়ে যাই।'

ললি টুনির সঙ্গে ফুল তুলতে গেলো। বাবু এক বার আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর গুটিগুটি ললি টুনিদের কাছে চলে গেলো। আমি ঘাসের ওপর বসে আকাশে রঙের খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, ডান পাশের পাহাড়ে একটা আলো এক বার জ্বলে উঠেই নিভে গেলো। তারপর ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। এমন সময় স্ক্যাটরা হঠাৎ গরগর করে উঠলো। আলোটা যেখানে দেখেছিলাম, তার অল্প দূরে তাকিয়ে দেখি একটা মানুষ। দেখে আমার গায়ের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে গেলো। বুকের ভেতরটা ধুপধুপ করতে লাগলো। মানুষ বললাম বটে— তবে মানুষ যে কখনো এতো লম্বা হতে পারে না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। আগাগোড়া সাদা আলখাল্লা পরা সেই মানুষটা অথবা অন্য যা কিছু হোক— পাহাড়ের প্রায় অন্ধকার গাছের তলায় হাঁটছিলো। ইচ্ছে করলেই অবশ্য ওটা আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কারণ দুই পাহাড়ের মাঝখানে যে ঢাল জায়গা, সেটা এতো গভীর যে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবে একেবারে নিচে বিকেলে একটা রূপোলি ফিতের মতো সরু নালা দেখেছি। পাহাড়ে এরকম প্রায়ই থাকে। কেউ ওটা পেরিয়ে এখানে আসতে চাইলে কম করে হলেও তিন-চার ঘণ্টা লেগে যাবে, ততোক্ষণে আমরা ঘরে ফিরে খেয়ে-দেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়বো; কিন্তু যদি মানুষ না হয়— কথাটা মনে হওয়া মাত্র আমার গলা-টলা সব শুকিয়ে গেলো। আর তখনই স্ক্যাটরা ওটার দিকে তাকিয়ে এতো জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো যে বাবু, ললি, টুনি সবাই 'কী হয়েছে'— বলে ছুটে এলো। ততোক্ষণে ওই আজগুবি মানুষটা একটা ঝাঁকড়া ছাতিম গাছের আড়ালে বাতাসের মতো মিলিয়ে গেছে।

ওদের সবার হাত ভর্তি বুনো লিলি। বাবু বললো, 'স্ক্যাটরা ও রকম চ্যাঁচালো কেন?'

আমি একবার টুনির দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, 'ও কিছু নয়। ইঁদুর-টিদুর কিছু দেখেছে বোধ হয়। স্ক্যাটরা পাহাড়ী ধেড়ে ইঁদুর দু' চোখে দেখতে পারে না।'

বাবু কথাটা বিশ্বাস করলো কিনা জানি না। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চলো, রাত হয়ে গেছে।'

আমাদের দেখে নেলী খালা বললেন, 'তোমাদের আরো আগে ফেরা উচিত ছিলো।' তারপর ফুলগুলো দেখেই লুফে নিলেন— 'কী চমৎকার লিলি! অনেক দিন আমার ইচ্ছে হয়েছে কিছু তুলে আনি। কোনোদিন আর আনা হয় নি।'

টুনি বললো, 'আজ আমার ইচ্ছে হলো—।'

বাধা দিয়ে বাবু বললো, 'তাই আমরা সবাই তুলে আনলাম।'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'থাক, এখন আর ঝগড়া করতে হবে না। আমাদের দু'জন গেস্ট এসেছে।'

টুনি বললো, 'লরেল হার্ডি তো? ওদের তো আমরাই পাঠালাম।'

নেলী খালার চোখ দুটো গোল হয়ে গেলো— 'লরেল হার্ডি কোথায় পেলে। মিস্টার ফতেউল্লা আর শ্রী গোবর্ধন নিয়োগী এসেছেন। চাটগাঁয়ে শুঁটকির কারবার আছে। যাবেন সেন্ট মার্টিনসে। এই এলাকায় সুবিধে মতো শুঁটকি পাওয়া যায় কিনা দেখবেন। যাও, বেশি হৈচৈ কোরো না। তোমাদের ঠিক নিচের ঘর দুটোই ওঁরা নিয়েছেন।'

ললি বললো, 'ওগুলো যে সাজানো হয় নি নেলী খালা!'

নেলী খালা কাঁধ ঝাঁকালেন— 'বলেছিলাম দোতালায় যে কোনো ঘরে থাকতে। ওঁরা রাজি হলেন না। বললেন, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে নাকি কষ্ট হয়। শ্রী গোবর্ধনের হাঁপানির রোগ আছে। তাই বড়িবি আর বাথিন মিলে তাড়াহুড়ো করে রুম দুটো কোনো রকমে গুছিয়ে দিয়েছে। ঘরে বেশি দাপাদাপি কোরো না। কাঠের মেঝেতে শব্দ হয় খুব।'

আমরা কি কচি খোকা যে দাপাদাপি করবো? নেলী খালা যেন কথা আর খুঁজে পেলেন না। বোঝা গেলো প্রথম গেস্ট পেয়ে নেলী খালা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আমরা চার জন একে অপরের দিকে তাকালাম। তারপর পা টিপে টিপে দোতালায় উঠলাম। ললি টুনিকে বললাম, 'খাবার পাটটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলে আমরা আবার কনফারেন্সে বসবো। জরুরি কথা আছে।'

টুনি বললো, 'খবরদার, কোনো ভূতের গল্পো শোনাতে পারবে না।'

বাবু বললো, 'তুমি তাহলে একলা ও-ঘরে থাকতে পারো। আমরা ললিকে নিয়েই প্ল্যান করবো।'

টুনি এগিয়ে এসে বাবুর পিঠে নরোম একটা কিল মেরে আদুরে গলায় বললো, 'আমাকে ভয় দেখালে ভালো হবে না বলছি।'

বাবু বললো, 'আমরা কি বলেছি তোমাকে ভয় দেখাবো?'

বাবু টুনির মিষ্টি ঝগড়াগুলো আমার আর ললির কাছে বেশ মজাই লাগলো। ললি বললো, 'আমরা কি গেস্টদের সঙ্গে খাবো?'

আমি বললাম, 'আমরা থাকলে কি লরেল হার্ডির খাওয়ার অসুবিধে হবে?'

ললি হেসে বললো, 'আমরা থাকলে হবে না। স্ক্যাটরা থাকলে হবে।'

অসুবিধেটা খাবার টেবিলে আমরা সবাই রীতিমতো উপভোগ করলাম। নেলী খালা চীনে হাঁসের রোস্ট করেছিলেন। লিকপিকে শ্রী গোবর্ধন এতো প্রশংসা করছিলো যে নেলী খালা বার বার লাল হয়ে শুধু — 'ধন্যবাদ, কী যে বলেন' বলছিলেন। আর শ্রী গোবর্ধনও এক টুকরো মাংস গিলেই 'মাইরি বলছি দিদি, এমন ফাস্টো কেলাস রান্না আমার বাপের জন্মে খাই নি'— এসব বলছিলো।

শ্রী গোবর্ধনের প্রশংসার বহর দেখে বাবু আর প্রশংসা করার সুযোগ পেলো না। অবশ্য প্রশংসা না করলেও আমি ওকে খাবার ঠিকই তুলে দিচ্ছিলাম। এমন সময় হেলেদুলে স্ক্যাটরা এসে নতুন মানুষদের একটু শুঁকে দেখবার জন্যে ওদের দিকে এগিয়ে গেলো। শ্রী গোবর্ধনের মুখে তখন হাঁসের একখানা আস্ত বুকের মাংস। স্ক্যাটরাকে দেখে ওই অবস্থাতেই তার চোখ দু'টো আলুর মতো গোল হয়ে কপালে উঠে গেলো। শুধু আঁ আঁ করতে লাগলো। নেলী খালা তখনো স্ক্যাটরাকে দেখেন নি। অবাক হয়ে শ্রী গোবর্ধনকে দেখছিলেন। শ্রী গোবর্ধন হাত নাচিয়ে কোনো রকমে মুখ কালো করে বললো, 'দিদি! —'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরোটা মিস্টার ফতের কোলের উপর ছিটকে পড়লো। আর স্ক্যাটরা এগিয়ে এসে আড়চোখে এক বার নেলী খালাকে দেখে মিস্টার ফতের কোল থেকে মাংসের টুকরোটা তুলে নিলো।

শ্রী গোবর্ধন ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। নেলী খালা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শরীর খারাপ করেছে? বাথরুমে যাবেন?'

বেরসিক লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে স্ক্যাটরা ততোক্ষণে ধমক খাবার ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। শ্রী গোবর্ধন লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে ধপ করে বসে পড়ে বললো, 'জল।'

নেলী খালা তাড়াতাড়ি পানি ভর্তি জগটা এগিয়ে দিলেন। শ্রী গোবর্ধন পানিটা গ্লাসে না ঢেলে জগের মুখেই খেতে শুরু করলো। সবাই প্রাণপণে হাসি চাপলেও টুনিটা ফিক করে হেসে ফেললো। নেলী খালা শুধু গম্ভীর মুখে একবার টুনির দিকে তাকালেন। টুনি সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

ঢকঢক করে জগের আদ্ধেক খালি করে সে হাঁপাতে লাগলো। নেলী খালা বললেন, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রী গোবর্ধন বললো, 'কালো কুত্তোটা। এই ছোঁড়াদের সঙ্গে সেই যে সন্ধেবেলা দেখেছিলাম।'

নেলী খালা পেছনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। শ্রী গোবর্ধন বললো, 'আরেকটু হলেই প্রাণ–পাখিটা বেরিয়ে যেতো। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই প্রাণীটাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না।'

নেলী খালা বললেন, 'কোথায় দেখলেন?'

শ্রী গোবর্ধন তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'চলে গেছে।'

মিস্টার ফতেকে দেখলাম মহা বিরক্ত হয়ে কটমট করে শ্রী গোবর্ধনের দিকে তাকালো। শ্রী গোবর্ধনের সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। তখন আমি পষ্ট শুনতে পেলাম, মিস্টার ফতে বিড়বিড় করে বলছে, 'ওস্তাদ যে কেন এমন কাজে এসব ভীতুর ডিমগুলোকে সঙ্গে দেয়, বুঝি না। গোবরটা দেখছি একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না।'

অন্য কেউ অবশ্য মিস্টার ফতের কথাগুলো খেয়াল করে নি। সবাই শ্রী গোবর্ধনকে দেখছিলো। নেলী খালা তখন বড়িবিকে ডেকে বললেন, 'খাবার সময় স্ক্যাটরাকে কেন এদিকে আসতে দিয়েছো?' এই বলে শ্রী গোবর্ধনের দিকে তাকালেন— 'ওটা আমার কুকুর স্ক্যাটরা। ভয় পাবার কিছু নেই।'

'কি ক্যাটরা?' শ্রী গোবর্ধনের কথার ভঙ্গিতে হাসি চাপা দায় হলো।

'স্ক্যাটরা।' নেলী খালা বললেন, 'বড়ো ভালো কুকুর।'

শ্রী গোবর্ধন ততোক্ষণে খাবারের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্লেট থেকে আরেকখানা মাংস তুলে নিতে নিতে বললো, 'কুত্তো যে কখনো ভালো হয়, আপনার কাছে এই প্রথম শুনলাম।'

কথাটা নেলী খালার পছন্দ হলো না। তিনি গম্ভীর মুখে খেতে লাগলেন। মিস্টার ফতে আরেক বার কটমট করে শ্রী গোবর্ধনের দিকে তাকালো। ভাগ্যিস নানু আমাদের আগেই খেয়ে নিয়েছিলেন। নইলে নেলী খালার গেস্টদের এ ধরনের ব্যবহার যে তিনি বিন্দুমাত্র পছন্দ করতেন না, এ কথা হলপ করে বলা যায়। এর পর খাবার পর্বটুকু নির্বিঘ্নেই শেষ হলো। আমরা সবাই চুপচাপ খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এলাম।

নানু স্টাডিতে বসে বই পড়ছেন। একটু পরে দুধ খেয়ে ঘুমোতে যাবেন। নেলী খালাও আর দোতালায় উঠবেন না। আমরা নিশ্চিন্ত মনে আলোচনায় বসলাম।

প্রথমেই ওদের সন্ধেবেলা দেখা সেই ঘটনাটা খুলে বললাম। আলো জ্বলে নিভে যাওয়া থেকে শুরু করে মানুষ না কি যেন তার বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছু শুনতে শুনতে টুনি একেবারে বাবুর গা ঘেঁষে বসেছে। বাবু বললো, 'টুনি সরে বসো। তোমার চুল আমার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।'

আমি বললাম, 'এই লোক দুটোকে তোমাদের কী মনে হয়? মিস্টার ফতেউল্লা আর শ্রী গোবর্ধন নিয়োগীকে?'

টুনি বললো, 'বেশ মজার লোক। লরেল খাবার টেবিলে যা করলো—' বলে ও একচোট হেসে নিলো, নেলী খালার ধমকের ভয়ে তখন যে হাসিটুকু এতোক্ষণ চেপে রেখেছিলো।

আমি তখন ফতের বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো ওদের বললাম। শ্রী গোবর্ধনকে ফতে 'গোবর' বলেছে শুনে টুনি আবার হেসে উঠলো। ললি তখন টুনিকে ধমকে দিলো— 'হেসো না টুনি, এটা হাসির কথা নয়।'

বাবু বললো, 'তোমার কী মনে হয়?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'গুঁটকির ব্যবসায়ীদের যে সাহসী হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। ফতের কথাগুলো লক্ষ কর। ও বলেছে, "ওস্তাদ কেন যে এমন কাজে"— কথা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কখনো ওস্তাদ থাকে বলে আমার জানা নেই। মালিক মহাজন থাকতে পারে। কিন্তু ওস্তাদ কথাটা আমি বইয়ে পড়েছি চোর-ডাকাতের দলের লোকেরাই বলে। আর "এমন কাজ" মানেটা কী? তাছাড়া কুকুরকে এরকম ভয় পেতে আমি কোনো ভালো লোককে কখনো দেখি নি। চোর-ডাকাতেরাই কুকুর ভয় পায়। এই ভয় চেপে রাখতে পারে নি বলেই ফতে বলেছে, "গোবরটা দেখছি কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না"।'

'তাই তো!' বেশ চিন্তিত গলায় বাবু বললো, ' লোকগুলোকে তো সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। পাহাড়ের ওটা না হয় কাল সকালে গিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু এ দুটো কে?'

ললি বললো, 'ডাকাত দলের কেউ নয় তো? রাতে ডাকাতি করে পালিয়ে যাবে?'

আমি বললাম, 'রাতে কিছু করতে পারবে না, স্ক্যাটরা আছে।'

ললি বললো, 'তবু আমাদের সাবধানে থাকা উচিত।'

বাবু বললো, 'ওদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

টুনি হাই তুলে বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

বাবু বললো, 'ঠিক আছে। চলো, তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিই। ছিটকিনিটা লাগাতে ভুলো না যেন।'

কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে সারাদিনের ব্যস্ততার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আন্নাকালীর পাহাড়ে আলোর সংকেত

পরদিন সকালে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি শ্রী গোবর্ধন আর মিস্টার ফতেউল্লা সেখানে নেই। নানু খেয়ে উঠে গেছেন। শুধু নেলী খালা স্ক্যাটরাকে বসে বসে শুকনো টোস্ট খাওয়াচ্ছেন। ললি বললো, 'তোমার গেস্টদের এখনো ঘুম ভাঙে নি নেলী খালা?'

নেলী খালা বললেন, 'ওরা খুব সকালে উঠে টেকনাফ গেছে। রাতে আসতে পারে। নইলে কাল ফিরবে।'

আমরা খেতে বসে গেলাম। পরিজ, টোস্ট, ডিম, মাখন টেবিলে সব স্তূপ হয়ে আছে। মনে হলো দু'মাসে শরীরটা বোধহয় ডবল হয়ে যাবে। বাবু বললো, ' নেলী খালা, আজ আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাবো।'

আমি আড়চোখে নেলী খালার দিকে তাকালাম। নেলী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'সোনার খনি খুঁজবে বুঝি?'

টুনি বললো, 'শুধু সোনার খনি কেন, আবির বলেছে পাহাড়ে নাকি হার্মাদদের লুকোনো গুপ্তধন আছে।'

আমি তখন টুনিকে ধমক লাগাতে গিয়ে বিষম খেলাম। ললি ভুরু কুঁচকে টুনির দিকে তাকালো। নেলী খালা আমাকে দেখে হেসে ফেললেন— 'যেখানেই যাও, দুপুরের আগে ফিরে আসবে। আমি একটু হিমছড়ি যাবো। কিছু জিনিসপত্তোর কিনতে হবে।'

ঘর থকে বেরুতে বেরুতে বাবু টুনিকে বললো, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না। গুপ্তধনের কথা নেলী খালাকে বলার কী হল শুনি?'

টুনি শুধু বাবুকে খানিকটা জিব বের করে দেখালো।

বাইরে রোদ ঝলমল করছিলো। বাতাস ঠাণ্ডা বলে রোদের তাপ গায়ে লাগলো না। সে কি জোর বাতাস! ললির খোলা চুল একেবারে এলোমেলো হয়ে গেলো। টুনি রোজই ঝোলানো সিং-এর মতো দুটো খোঁপা করে। তাই ওর চুল কিছুটা ঠিক ছিলো। আমার আর বাবুর তো কথাই নেই। ললির চুলের ওপর কটা রাধাচূড়ার পাপড়ি উড়ে এসে পড়লো। আমি দেখলাম, ললির চোখের পাতা দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। বাবু আর টুনি হাত ধরাধরি করে আমাদের আগে আগে হাঁটতে লাগলো। স্ক্যাটরা আমার পাশে হাঁটছিলো। আমরা সেই সোনাবালি নদীর দিকে যাচ্ছিলাম, যেখানে নেলী খালা তিন রত্তি সোনা পেয়েছিলেন।

নদীতে যেতে হলে পাহাড়ী পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর কিছু দূর হাঁটতে হয়, নেলী খালা পথ বলে দিয়েছিলেন।

আমরা তখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম। বাবু আমাকে বললো, 'মড়ার মাথার খুলি আঁকা কোনো গাছ চোখে পড়ে কিনা দেখো তো।'

টুনি বুনোফুল, প্রজাপতি আর পাখি দেখতে দেখতে একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলো। বাবুর কথা ওর কানে যাওয়া মাত্র ও তিন লাফে ললির কাছে এসে গেলো। বাবু গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেললো—'দিনের আলোতেও ভয় !'

মড়ার খুলি আঁকা গাছের আগে সোনাবালি নদীটাই চোখে পড়লো। ঠাণ্ডা ইস্পাতের চাদরের মতো চকচক করছিলো নদীটা। কাছে এসে বোঝা গেলো পানিটা চুপচাপ বসে নেই— মসৃণ এক স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। আর নদীতে এতো স্বচ্ছ পানি থাকতে পারে, আগে কখনো ভাবতে পারি নি। অবশ্য আমার নদী দেখা মানে বুড়িগঙ্গা আর ট্রেনে যে ক'টা নদী দূর থেকে চোখে পড়ে। নদীর তলায় সূর্যের আলো পড়ে সারা নদী আলো হয়ে আছে। তলায় সোনালি বালি চিকচিক করছে। এতটুকু শ্যাওলা নেই কোথাও। ছোট বড়ো অনেক রকম মাছ পরম নিশ্চিন্তে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা মাছ আমাদের পায়ের শব্দ শুনে পানির ওপর মাথা তুলে দেখলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরার গরগর গলার শব্দ শুনে কয়েকটা বুদবুদ উড়িয়ে টুপ করে পালিয়ে গেলো।

ললি বললো, 'মাঝখানে খুব বেশি গভীর নয়।'

টুনি গম্ভীর হয়ে বললো, 'তবু তুমি ডুবে যাবে।'

ললি ওর কথায় কান না দিয়ে বললো, 'আরো হাঁটবে, না এখানে বসবে ?'

বাবু বললো, 'বসবে কি ? আমরা নিশ্চয়ই পিকনিক করতে আসি নি !'

আমি বললাম, 'কিছুক্ষণ বসা যাক বাবু। ভারি সুন্দর লাগছে। এরকম নিরিবিলি পাহাড়ী নদীর কথা শুধু বইয়ে পড়েছি।'

বাবুর খুব একটা বসার ইচ্ছে ছিলো না। তবু বসলো। বিড়বিড় করে বললো, 'মাঝে মাঝে তোমার যে কী হয় !'

আমি মনে মনে হাসলাম। ললি বসতে চাইলো বলেই তো বসলাম। ও অবশ্য বসার কথা বলে নি, তবে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম বসতে চাইছে। ললি গভীর চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি একটু হাসলাম। টুনি ততোক্ষণে পাতলা পাথরের টুকরো নিয়ে নদীতে ব্যাঙ লাফানোর খেলা শুরু করে দিয়েছে।

আমি আর ললি একটা গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। স্ক্যাটরা শুয়েছিলো আমাদের পাশেই। গরমে ওর জিব বেরিয়ে গেছে। নদীর ওপারে সেগুন আর বুনো ঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। আমি ভাবছিলাম, এক দিন চার জন মিলে যদি ওই জঙ্গলে হারিয়ে যাই, তাহলে বেশ হয়। কথাটা ললিকে বলবো, এমন সময় দেখি নদীর ওপারে অনেক দূর দিয়ে দুটো লোক হনহন করে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছে। ললিও ওদের দেখতে পেলো। উত্তেজিত গলায় বললো, 'দেখো, দেখো— আমাদের সেই লরেল হার্ডি।'

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম— 'তাই তো, এ যে দেখি মিস্টার ফতে আর শ্রী গোবর্ধন!' বাবু টুনিকে ডেকে দেখালাম। ওরা এতো অবাক হয়ে গেলো যে কিছুই বলতে পারলো না। বাবু অনেকক্ষণ পর বললো, 'ওরা না টেকনাফ গেছে ? রাতের আগে ফিরবে না?'

আমি বললাম, 'দেখা যাক দুপুরে ওরা খেতে আসে কিনা। যদি আসে তাহলে বুঝবো, হয়তো কোনো কারণে টেকনাফ যায় নি।'

ললি বললো, 'টেকনাফ না গেলেও ওরা ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ?'

টুনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'চলো, আমরা এপার থেকে ওদের ফলো করি। দেখি ওরা কোথায় যায়।'

টুনির কথাটা আমাদের সবারই পছন্দ হলো। টুনি একটা কাজের কথা বলেছে বটে। আমি ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'ঠিক বলেছো টুনি। চলো, ওদের ফলো করি।'

ফলো করার কথা শুনে স্ক্যাটরা কী বুঝলো জানি না। তবে ও লাফিয়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগলো।

আমরা চার জন গাছের আড়ালে চলে গিয়ে ওদের ফলো করতে লাগলাম। প্রথম দিকে অনেকখানি পথ দৌড়ে ওদের কাছে এসে গিয়েছিলাম। শ্রী গোবর্ধনরা বেশ জোরেই হাঁটছিলো। জায়গাটা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে অনেকটা মালভূমির মতো। তাই গাছপালা খুব ঘন ঘন হয়ে গজিয়েছে। টুনি তো এক বার একটা বুনো লতার সঙ্গে পা আটকে ধপাস করে পড়ে গেলো। বাবু ছুটে গিয়ে টেনে তুললো ওকে। ঘাসের ভেতর পড়েছে বলে খুব একটা লাগে নি। স্ক্যাটরা শ্রী গোবর্ধনদের দেখতে পেয়েছে। এক বার জোরে ডেকে উঠতে যাচ্ছিলো, ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়েছি। এ ধরনের ইশারা-ইঙ্গিত স্ক্যাটরা খুব ভালো বোঝে।

টুনির পর এবার বাবুর পালা। বাবু শুধু বুনো লতায় পা আটকেই পড়লো না, সেই সঙ্গে ওর জামাটা শক্ত কাঁটা ঝোপের ভেতর আটকে গেলো। টানতে গেলে সুন্দর জামাটা ছিঁড়ে যাবে, তাই আমরা সবাই মিলে একটা একটা করে কাঁটা ছাড়িয়ে ওকে উদ্ধার করলাম। ওর হাতেও কাঁটার আঁচড় লেগেছে। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই। শুধু টুনি কিছু ঘাস চিবিয়ে ওর হাতে লাগিয়ে দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম শ্রী গোবর্ধনরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে ; প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি।

আমরা আবার ছুটলাম। এবার আরো বেশি করে ঝোপে আটকে গেলাম। অচেনা পথে যা হয়। আমরা যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখি শ্রী গোবর্ধনরা পাহাড় বেয়ে এটা-ওটা ধরে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদের মতো আমরাও যদি নদীর এ পাড়ে পাহাড় বেয়ে উঠি, তাহলে ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্বটা অনেক বেড়ে যাবে। এক হতে পারে নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়া। কিন্তু এদিকে নদীটা পাহাড় থেকে নামছে বলে স্রোতের বেগ খুব বেশি; মাঝে মাঝে পাথর-টাথরও গড়িয়ে পড়ছিলো।

আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ঝাঁকড়া ছাতিম গাছের আড়ালে ওরা হারিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার আগের দিনের ঘটনাটা মনে পড়লো। সেই লম্বা মানুষটাও এই রকম একটা ছাতিম গাছের আড়ালে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিলো। আমাদের পাহাড়টার ওপরে তাকালাম। গাছপালার মাথার ভেতর দিয়ে অনেক দূরে মেজর জাহেদের লাল টালির ছাদঅলা বাংলোটা চোখে পড়লো। বাবুকে বললাম, 'কিছু বুঝতে পারছো ?'

বাবু ললি টুনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'কাল ঠিক এই গাছটার তলা থেকেই সেই লোকটা কর্পুরের মতো উবে গিয়েছিলো। আশেপাশে আর কোথাও ছাতিম গাছ নেই। ওদিকে চেয়ে দেখো, মেজরের বাড়িটা; কাল বিকেলে আমরা যেখানে গিয়েছিলাম।'

ওরা সবাই এক বার ছাতিম গাছ আর এক বার মেজরের বাংলোটা দেখলো। সবাই রীতিমতো অবাক হয়ে গেছে। টুনি বললো, 'আমরা তাহলে মেজরের বাড়ির কাছেই আছি!'

বাবু বললো, 'চলো, ওপরে ওঠা যাক।'

আমরা সবাই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। এ পাহাড়ে গাছপালা খুব বেশি নেই। রবারের চাষ করার জন্যে মেজর জমি-টমি পরিষ্কার করে ফেলেছেন। কয়েকজন লোক মাটি কাটছিলো। চুলের ছাঁট দেখেই বোঝা যায় এরা কারা।

ওপরে উঠে সবাই রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। গেটের কাছে আগের মতো বনমালী দাঁড়িয়ে ছিলো। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'জাহেদ মামা আছেন না ?'

বনমালী ভুরু কুঁচকে বললো, 'সে কি বাছা ! তিনি তো সকালেই তোমাদের বাড়িতে গেছেন।'

বাবু বললো, 'তাই তো, মনেই ছিলো না। আমাদের পানি খাওয়াতে পারেন বনমালী বাবু ?'

বনমালী এতোখানি জিব কেটে বললো, 'তা কেন পারবো না বাছা। এসো, ঘরে এসো।'

আমরা সবাই বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম।

বনমালী ফ্রীজ থেকে পানির বোতল আর তবক-মোড়া সন্দেশ বের করে দিলো। প্রত্যেকে পুরো এক বোতল পানি শেষ করে বুঝলাম আমাদের আসলে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিলো। স্ক্যাটরাও এক বাটি পানি সাবাড় করে জিব বের করে গরমে হাঁপাতে লাগলো। আমি আর বাবু বাংলোর ঠাণ্ডা লাল সিমেন্টের মেঝেতে শুয়ে পড়েছিলাম। টুনি বললো, 'অতো শুয়ে আর কাজ নেই। দেরি করলে নেলী খালা আবার আমাদের খুঁজতে বেরুবে।'

আমরা উঠে পড়লাম। স্ক্যাটরা বেচারা আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলো। আমাদের হাঁটতে দেখে ও একটা হাই তুলে পেছন পেছন আসতে লাগলো।

মেজরের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো পথে। তিনি রীতিমতো হৈচৈ করে উঠলেন— 'কিহে, কাল যে বললে সকালে দেখা হচ্ছে। আজ দেখি সকাল না হতেই সব হাওয়া। আমি এতোক্ষণ তোমাদের জন্যে বসে ছিলাম।'

টুনি বললো, 'আপনার বাসা থেকে ফ্রীজের পানি আর সন্দেশ খেয়ে এলাম।'

আমি বললাম, 'দুপুরে আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন ভেবেছিলাম। তাই এদিকটা ঘুরেফিরে দেখছিলাম।'

'নেলী তাই বলছিলো। কিন্তু আমাকে খেয়েই এক জায়গায় বেরুতে হবে।' এই বলে মেজর ডান চোখ টিপলেন —'খবর পেলাম সন্ধের দিকে ওদিকটায় কিছু শিকার-টিকার পাওয়া যাবে। যাই দেখি।'

আমরা সবাই হাসলাম। ললি বললো, 'কাল এসে শিকারের গপ্পো শুনিয়ে যাবেন।'

মেজর হেসে বললেন, 'নেলীও আমাকে ঠিক তাই বলেছে। ঠিক আছে, কাল যাবো। সকালে অন্য কোথাও পালিয়ে যেও না। চলি তাহলে।'

আমরা এগিয়ে গেলাম। টুনি হঠাৎ ফিক করে হেসে বললো, 'আবির যে তখন মেজরকে জাহেদ মামা বললেন ? উনি কি আপনার মামা ?'

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'বারে, নেলী খালার বন্ধু তো ! মামা বললে দোষ কী ? তাছাড়া মেজর জাহেদ বললে বনমালী ক্ষেপে যেতো। এখন ভাববে সত্যিই বুঝি মামা হন।'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'এমনও তো হতে পারে, ক'দিন পরে খালু হয়ে গেলেন। নেলী খালার বন্ধু যখন—!'

টুনি ছুটে এসে বাবুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বললো, 'যাঃ, কী অসভ্য! দাঁড়াও, আমি নেলী খালাকে বলে দেবো।'

আমাদের নেলী খালা এক চোট বকলেন— 'জাহেদ এতোক্ষণ বসে রইলো তোমাদের জন্যে। এই ভরদুপুরে কেউ বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় !'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'জাহেদ মামার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে।'

নেলী খালা রাগতে গিয়ে হেসে ফেললেন— 'এর ভেতর আবার মামাও বানানো হয়েছে!'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'বারে, তোমার বন্ধু যে !'

নেলী খালা তখন লাল-টাল হয়ে বললেন, 'হয়েছে। এবার খাওয়ার পর্বটা সেরে আমাকে উদ্ধার করো।'

বাবু বললো, 'লরেল হার্ডি এসেছিলো নেলী খালা ?'

নেলী খালা অবাক হয়ে বললেন, 'ওরা কেন আসবে ? ওরা টেকনাফ গেছে, তোমাদের বলি নি ?'

টুনি এমন সময় তড়বড় করে বললো, 'জানো নেলী খালা, আমরা না—'

সঙ্গে সঙ্গে বাবু টুনির কনুইতে এক রাম চিমটি কাটলো। টুনি চুপসে গিয়ে মিনমিন করে বললো, 'আমরা যে জাহেদ মামার বাড়িতে সন্দেশ খেয়েছি, সে কথাও বুঝি কাউকে বলতে পারবো না ?'

আমি আর ললি একসঙ্গে হেসে উঠলাম। বাবুও হেসে ফেললো। টুনি রেগেমেগে সিঁড়িতে ধুপধাপ পা ফেলে দোতালায় উঠে গেলো।

খেয়ে উঠে আমরা আবার আলোচনায় বসলাম। আমি বললাম, 'নেলী খালার গেস্ট দু'জন যে নিরীহ শুঁটকির ব্যাপারি নয়, এর আরেকটা প্রমাণ পাওয়া গেলো।'

টুনি বললো, 'নিশ্চয়ই ভীষণ পাজি লোক হবে ওরা।'

বাবু পরিষ্কার জানিয়ে দিলো — 'লরেল হার্ডি গুপ্তধন খোঁজার জন্যেই এখানে আসুক, কিম্বা সোনার খনির লোভেই আসুক — আসল রহস্যটা আমরা খুঁজে বার করবোই। আমি বাপু বড়োদের সাহায্য নিয়ে কোনো কাজ করা পছন্দ করি না।'

কথাটা বাবু মন্দ বলে নি। তাছাড়া সত্যি সত্যিই যদি এসব কিছু না হয়, অর্থাৎ এই পাহাড়গুলোতে যদি সোনার খনি বা গুপ্তধন জাতীয় কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে বড়োদের বলে শেষে ভারি লজ্জায় পড়তে হবে। তাই এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হলাম যে, বড়োদের কাউকে আমাদের তদন্তের কথা বলা যাবে না। 'তদন্ত' কথাটা আমি এতো গভীরভাবে বলেছিলাম, ঠিক যেভাবে শার্লক হোমস তাঁর সহকারী ওয়াটসনকে বলতেন। টুনি হাসবার সুযোগই পেলো না।

আমরা ঠিক করেছিলাম বিকেলে ছাতিম গাছঅলা সেই পাহাড়টায় যাবো। মালীকে ওটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। মালী বললো, 'ওটা তো আন্নাকালীর পাহাড়। ছাতিমতলায় আন্নাকালীর একটা মন্দির আছে। সেই পাহাড়ে পাকড়াশী মশাইও থাকেন।'

আমাদের দরকার ছাতিমতলা। আন্নাকালী বা পাকড়াশী মশাই নয়। বিকেলে যখন বেরুতে যাবো, তখনই নেলী খালা বাধা দিলেন, 'উঁহু। আজ বাইরে যাওয়া হবে না। আকাশের অবস্থা দেখো নি!'

বাইরে এসে দেখি আকাশের পশ্চিম কোণে দূরে সমুদ্রের ওপর এক টুকরো ভারি কালো মেঘ। তাছাড়া সারা আকাশে কোথাও সামান্য মেঘের ছায়াও নেই। আমি বললাম, 'ওইটুক মেঘে আর কতটুকু বৃষ্টি হবে নেলী খালা ?'

নেলী খালা বললেন, 'বৃষ্টি নয়, ঝড়। তিন নম্বর ডেঞ্জার সিগন্যাল দিয়েছে। আব্বু যদি শোনেন তোমাদের এ সময় বেরুতে দিয়েছি, তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।'

দুপুরে বাবু টুনির উৎসাহটা ছিলো সবচেয়ে বেশি। ওদের চেহারাটা সেই কালো মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে গেলো। আমরা চারজন বাইরে লনে গিয়ে বসলাম।

নেলী খালাদের এই পাহাড়টা আশেপাশের পাহাড়গুলোর চেয়ে বেশি উঁচু। এখানে বসে সব দেখা যায়। বিরাট লনের চারপাশটা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে অবশ্য এক-আধটা রেলিং ভেঙে গেছে। আমরা একেবারে পশ্চিমের রেলিংটার ধারে বসেছিলাম। রেলিং-এর ওপাশে অল্প একটু সমান জায়গা। তারপরই পাহাড়টা একগাদা বুনো ঝাউগাছ মাথায় নিয়ে একেবারে সমুদ্রে নেমে গেছে। দেড় শ' ফুটের মতো খাড়া নেমেছে। তারপর অবশ্য ধাপ আছে। তবে ইচ্ছে করলেই এখান থেকে কেউ সমুদ্রে নেমে যেতে পারবে না। আমি ছাতিম গাছঅলা পাহাড়টাও খুঁজে বের করলাম। ললি বললো, 'আবির যে বলছিলে এ বাড়ির কোথাও গুপ্তধনের নকশা আছে কিনা খুঁজে দেখবে ? আমার মনে হয় ওটা আমাদের খোঁজা উচিত।'

বাবু এতোক্ষণ আনমনে ঘাসের কচি ডগা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবোচ্ছিলো। ও বললো, 'ঠিক বলেছো ললি। আমার মনে হয় লরেল হার্ডি সেই গুপ্তধনের খোঁজেও এখানে আসতে পারে।'

আমি বললাম, 'কথাটা আমিও ভেবেছি। বিশেষ করে ওরা যে-দুটো ঘরে আছে সে-দুটো ঘরই ভালো করে খুঁজতে হবে। নইলে বাড়ি ভর্তি এতো ঘর থাকতে ওরা ও দুটো ঘরে কেন থাকতে চাইবে।'

টুনি বললো, 'ওরা যে বললো, ওদের হাঁপানি আছে ?'

বাবু বললো, 'হাঁপানি থাকলে কেউ ওরকম তরতর করে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ওরা ফিরে এলেই আমাদের কাজ হবে সারাক্ষণ ওদের দিকে নজর রাখা। ওদের টেকনাফ তো ওই আন্নাকালীর পাহাড়ে।' বলে আঙুল তুলে দেখালাম।

বাবু বললো, 'এখান থেকে তো মনে হয় বেশি দূরে নয়। ওরা এলে জিজ্ঞেস করবো ওরা টেকনাফ গিয়েছিলো কিনা; কী বলো তোমরা ?'

ললি বললো, 'ওরা যদি স্বীকার করে ওরা আন্নাকালীর পাহাড়ে গিয়েছিলো, তাহলে বুঝতে হবে হয় তারা খুবই বোকা নয়তো ভালো লোক।'

টুনি বললো, 'ভালো লোক হলে কেউ ওভাবে কথা বলে নাকি। নির্ঘাত ওরা খারাপ মতলবে এসেছে।'

কালো মেঘটা কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিমের সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। ললি বললো, 'সত্যিই তাহলে ঝড় আসছে।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ঝড় তো আসবেই। জাহেদ মামাও বিপদসংকেত পেয়েছেন।'

দেখতে দেখতে সারা আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেলো। ঝড়ো-বাতাস বইতে শুরু করলো। সমুদ্রটা হিংস্র হয়ে প্রচণ্ড গর্জন শুরু করে দিলো। সমুদ্রকে নিজের প্রতিপক্ষ ভেবে স্ক্যাটরাও সমানে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো। ভাবখানা এই— একবার কাছেই এসো না বাছা, টুঁটিটা কামড়ে ধরবো না! নেলী খালার হাঁকডাক শুনে আমরা ঘরে ফিরে গেলাম।

জানালা-দরজা সব বন্ধ করে নানুর সঙ্গে স্টাডিতে বসে চা খেলাম। নানু বললেন, 'কেমন লাগছে জায়গাটা ?'

বাবু বললো, 'অদ্ভুত সুন্দর জায়গা !'

টুনি বললো, 'রূপকথার মতো !'

নানু হেসে বললেন, 'সবাই নেলীকে এখানে আসার জন্যে বকেছে। কিন্তু আমি বকি নি। বুড়ো বয়সে সময় কাটানোর জন্যে আমি এরকম একটা নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট জায়গাই খুঁজছিলাম।'

আমি মনে মনে হাসলাম। এই জায়গাটাকে ঘিরে এত সব পাজি লোকের ষড়যন্ত্র চলছে, এ বাড়িটা, এ বাড়ির মানুষরা কেউ যে সেই ষড়যন্ত্রের বাইরে নয়— নানু যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান, তাহলে পর দিনই নেলী খালাকে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দেবেন। কোনো রকম ঝামেলাই নানু পছন্দ করেন না।

নেলী খালা বললেন, 'মনে হয় মিস্টার ফতে আর শ্রী গোবর্ধন আজ রাতে ফিরবে না। যা ঝড় শুরু হয়েছে!'

আমি ভাবলাম, টেকনাফ গেলে হয়তো ফিরতো না, কিন্তু যায় নি যখন ফিরতেও পারে।

শেষ পর্যন্ত ওরা এলো বটে, তবে ঝড়বৃষ্টিতে একাকার হয়ে। সারা গায়ে কাদা-টাদা লেগে সে এক দেখার মতো দৃশ্য বটে। আমরা যখন রাতের খাবার শেষ করে শুতে যাচ্ছিলাম, তখনই ওরা দু'জন মূর্তিমান ঝড়ো কাক এসে হাজির হলো। স্ক্যাটরা প্রথমে চিনতে পারে নি; পরে শ্রী গোবর্ধনের ভয়ের বহর দেখে বুঝলো ইনিই কাল রাতের তিনি। হুঙ্কার ছাড়তে যাবে— তখনই নেলী খালা ওকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর ওদের দু'জনকে বললেন, 'একেবারে ভিজে গেছেন দেখি ! এতো রাতে না ফিরলেও পারতেন। ঝড়বৃষ্টিতে পাহাড়ী রাস্তার অবস্থা ভালো থাকে না।'

শ্রী গোবর্ধন হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'ওসব আমাদের অব্যেশ আছে।'

মিস্টার ফতে ওর দিকে কটমট করে এক বার তাকিয়ে খুব মোলায়েম গলায় নেলী খালাকে বললো, 'আমরা ফিরেছি সন্ধের অল্প আগে। এতোক্ষণ হাটে বসে আলাপ করছিলাম এক মহাজনের সঙ্গে। এইটুকু পথ আসতেই এই অবস্থা।'

বাবু বললো, 'আপনারা কি সারাদিনই টেকনাফে কাটালেন ? নাকি আরও কোথাও গিয়েছিলেন ?'

মিস্টার ফতে বাবুকে সব ক'টা দাঁত দেখিয়ে বললো, 'আর কোথায় যাবো, টেকনাফের আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলতেই দিন কেটে গেলো। দেখে এসো এক দিন; ভারি সুন্দর জায়গা।'

মিস্টার ফতের মিথ্যে বলার বহর দেখে শ্রী গোবর্ধনও হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। নেলী খালা বললেন, 'বাথরুমে পানি আছে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আসুন।'

ওরা যখন খাচ্ছিলো, আমরা চার জন তখন আমাদের ঘরে। খাবার শেষ করে ঘরে ঢুকে ওরা দরজা বন্ধ করলো— শব্দ শুনে ঠিক টের পেলাম ললিদের নিচের ঘরে মিস্টার ফতে আর আমাদের নিচের ঘরে শ্রী গোবর্ধন আস্তানা গেড়েছে।

হঠাৎ ভারি একটা কিছু সরানোর শব্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি মেঝের উপর কান পাতলাম। একটু পরে ফতের গলা শোনা গেলো— 'আমি যাচ্ছি গোবরা। আলোটা দেখাতে ভুলিস না।' আবার আগের মতো ভারি কিছু সরানোর শব্দ হলো।

শ্রী গোবর্ধন গজগজ করে বলতে লাগলো, 'বাব্বা ! ওজন বটে একখানা ! উনি তো দিব্যি আলো দেখাতে বলে গেলেন। রাতে যদি কুত্তোটা ছাড়া থাকে, তবেই আমি মরেছি।'

একটু পরে চটাশ করে মশা মারার শব্দ শুনলাম। তারপরই শ্রী গোবর্ধন বললো, 'ধুত্তোরি ছাই, কবে যে পাওনা-গণ্ডা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবো, ঈশ্বরই জানেন।' তারপর কোনো শব্দ শোনা গেলো না।

বাবুও আমার মতো কান পেতে ওদের সব কথা শুনেছে। বললো, 'যাই বলে কোথায় গেলো ফতে ! ওর ঘরে যাবার শব্দ তো পেলাম না ?'

আমি বললাম, 'তোমরা একটু বসো। আমি দেখে আসি।'

পা টিপে টিপে নিচে এসে ফতের দরজায় আস্তে করে ধাক্কা দিলাম। যা ভেবেছিলাম, তা-ই। দরজা খোলা, ঘরে ফতে নেই। দরজাটা আবার টেনে দিয়ে পাশের বাথরুমেও দেখলাম। কেউ নেই। ওপরে এসে ওদের বললাম। ললি ফিসফিস করে বললো, 'এর পাশের ঘরে যায় নি তো!'

আমি বললাম, 'ওটার তো এখনো তালাই খোলা হয় নি।'

ললি বললো, 'সেজন্যেই তো বলছি। ভেতরের দরজা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গুপ্তধনের নকশাটা হয়তো ও ঘরেই আছে।'

আমি তখন আমাদের পাশের ঘরে গিয়ে মেঝেতে কান পাতলাম। কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। ফিরে এসে বললাম, 'না, ওখানে নেই। গুপ্তধনের নকশা খুঁজতে গেলে ওর চলাফেরার শব্দ অন্তত শুনতে পেতাম।'

টুনি গালে হাত দিয়ে বললো, 'তাই তো, কোথায় গেলো তাহলে ?'

শ্রী গোবর্ধনের আলো দেখার জন্যে আমরা বেশ রাত অব্দি জেগে রইলাম। হঠাৎ এক সময় খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। বাবু আর টুনিকে ললিদের ঘরে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম, 'ওদিকটায় তোমরা নজর রাখো। আমরা এদিকে দেখছি।'

ওরা চলে গেলো। আমি আর ললি অন্ধকার ঘরে বসে রইলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। বুঝলাম, শ্রী গোবর্ধন ওপরে উঠছে। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ও দোতালায় এসেও থামলো না। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলো। আমরা জানালার কাছে গেলাম।

বাইরে ঝড়ের বেগ কিছু কমলেও জোর বাতাস বইছিলো। তবে বৃষ্টিটা থেমে গেছে। হঠাৎ দেখি সমুদ্রের ভেতর অন্ধকারে একটা ছোট্ট আলো জ্বলে উঠলো। একটু পরে আবার নিভে গেলো। আবার জ্বললো। কয়েক বার এরকম করলো : তারপর একেবারে নিভে গেলো।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়িতে শ্রী গোবর্ধনের পায়ের শব্দ শুনলাম। সিঁড়িতে দেয়াল-বাতি জ্বলছিলো। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম, ওর হাতে বিরাট লম্বা একটা টর্চ। টর্চ যে কখনো এতো লম্বা হতে পারে, আমার ধারণাই ছিলো না। ও বিড়বিড় করে বলছিলো, 'ভাগ্যিস কুত্তোটা টের পায় নি। কালকের রাতটা এভাবে কাটাতে পারলে বাঁচি।'

নিচের ঘরে ঢুকে শ্রী গোবর্ধন ছিটকিনি লাগিয়ে দিলো। একটু পর বাবু আর টুনি উত্তেজিত গলায় বললো, 'কিছু দেখেছো তোমরা ?'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আস্তে। তোমরা কী দেখলে?'

টুনি বললো, 'আলো দেখেছি।'

বাবু বললো, 'দূরের সেই ছাতিম গাছঅলা আন্নাকালীর পাহাড়ে আলো জ্বলতে দেখেছি। একটা আলো কয়েক বার জ্বললো আর নিভলো। বেশ কিছুক্ষণ এ রকম করেছিলো।'

টুনি বললো, 'কিন্তু গোবরটা কোথেকে আলো দেখালো ? তোমরা কিছু দেখলে ?'

এরপর আমি আমাদের দেখার কথা বললাম, 'শ্রী গোবর্ধনের হাতে বিরাট টর্চ ছিলো। ও ছাদে গিয়ে আলো দেখিয়েছে।'

বাবু বললো, 'আমরা ছাদের দিকেও দেখেছিলাম। কই, সেখানে তো কোনো আলো দেখি নি!'

আমি বললাম, 'সোজা আকাশের দিকে আলো দেখালে তুমি এখান থেকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ওই পাহাড় আর সমুদ্র থেকে ঠিকই দেখা যাবে।'

একটু পরে নিচের ঘরে ঘর্ঘর শব্দ হলো। মনে হলো শ্রী গোবর্ধন ভারি কিছু নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে। মেঝেতে কান পাতলাম। শ্রী গোবর্ধন বললো, 'কিরে ফতে, পেলি কিছু ?'

ফতে জবাব দিলো, 'না, কাল পাবো।'

এরপর ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। বোঝা গেলো ফতে এতক্ষণে ওর নিজের ঘরে গেছে।

সে রাতে আমরা কেউ ভালোমতো ঘুমুতে পারলাম না। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম — কালও তাহলে ওরা আলো দেখাবে। মনে মনে ঠিক করলাম — কাল সকাল থেকে পুরোদমে তদন্ত শুরু করবো।

আমাদের তদন্ত শুরু হলো

ঘুম থেকে উঠে যখন নিচে এলাম, তখন নেলী খালা বললেন, 'বাব্বা, এতো ঘুমোতে পারো তোমরা ! আমি দু'বার ডাকতে গিয়েছিলাম তোমাদের। সবার নাস্তা খাওয়া হয়ে গেছে। তোমরা চার মূর্তিই শুধু বাকি।'

বাবু বললো, 'খুব বেশি দেরি করেছি কি নেলী খালা ?'

নেলী খালা তাঁর হাত-ঘড়িটা দেখে হেসে ফেললেন— 'মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে ! খুব বেশি আর দেরি কোথায় ?'

টেবিলে বসে খেতে খেতে আমি বললাম, 'তোমার গেস্টরা কী করছে নেলী খালা ?'

নেলী খালা বললেন, 'কী আর করবে ! সকাল থেকে দু'জন ঘরে বসে আছে। বললো, বৃষ্টিতে ভিজে নাকি ওদের গা ম্যাজম্যাজ করছে। এ বেলা আর বেরুবে না।'

টুনির তখনো দু'চোখ ভরা ঘুম। নেলী খালা বললেন, 'টুনি, আরেকটা ডিম নাও।'

টুনি ঢুলুঢুলু চোখে বললো, 'কখন গেলাম !'

নেলী খালা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাকে ডিম নিতে বলছি টুনি !'

টুনি বাবুর পাতে একটা ডিম তুলে দিলো। নেলী খালা তখন ললিকে বললেন, 'টুনি কি কাল সারা রাত ঘুমোয় নি ললি ?'

ললি বললো, 'আমি তো সারা রাতই ঘুমিয়েছি নেলী খালা।'

নেলী খালা তখন রেগেমেগে লেস বুনতে শুরু করলেন। গজগজ করতে করতে বললেন, 'বুঝেছি, রাতে তোমরা কেউ ঘুমোও নি।'

স্ক্যাটরা এমন সময় সুর করে— 'ঘেউ-উ' বলে কাউকে অভ্যর্থনা জানালো। তাকিয়ে দেখি জাহেদ মামা। হাতে একখানা চিঠি। বললেন, 'সুখবর নেলী ! জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে তোমার চিঠি এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুমঘুম ভাব আর নেলী খালার রাগ কর্পূরের মতো উবে গেলো। একগাল হেসে নেলী খালা বললেন, 'বসো, এক কাপ কোকো খাও। কী লিখেছে ওরা ?'

'তাহলে পড়ে শোনাই ?' এই বলে একটা চেয়ার টেনে বসে জাহেদ মামা চিঠিটা খুললেন— 'শোনো সবাই, প্রিয় মহাশয়া, আপনার পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, আপনি অনুমান করিতেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ব্যাপক অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অত্র অঞ্চলের একটি নদীর বালি হইতে আপনি কিছু পরিমাণ স্বর্ণ উদ্ধারও করিয়াছেন। স্বাধীনতার পূর্বে উক্ত অঞ্চলে কিঞ্চিৎ জরিপ হইলেও বর্তমানে উহার ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্য চালানো আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা একটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করিয়াছি। দুই-তিন দিনের মধ্যে ওই অঞ্চলে আমরা তৈল অনুসন্ধানের জন্য একদল ভূতত্ত্ববিদকে পাঠাইতেছি। তাঁহাদের সঙ্গে দুই জনকে স্বর্ণ অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হইতেছে। আপনার পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার মূল্যবান পরামর্শ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না। ভবদীয়— নামটা পড়া যাচ্ছে না, পরিচালক বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ।'

চিঠি পড়া শেষ করে জাহেদ মামা নেলী খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও কি এরকম ভাষায় ওদের লিখেছিলে ?'

নেলী খালা সে-কথায় কান না দিয়ে একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তোমার কি মনে হয় জাহেদ, এখানে সোনার খনি পাওয়া যাবে ?'

জাহেদ মামা হেসে বললেন, 'সম্ভাবনাটাকে এরা একেবারে উড়িয়ে দেয় নি। আর হলে তো তোমারই লাভ। সী ভিউ প্যালেস সারা মাস গেস্ট-ভর্তি থাকবে।'

নেলী খালা লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, 'কী যে বলো ! নাও, কোকোটা ঢেলে খাও।'

গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, এখানে সত্যিই সোনার খনি আছে। আর কে যেন সেখান থেকে গোপনে সব সোনা সরিয়ে ফেলেছে। আমরা যখন খনিটা আবিষ্কার করলাম, তখন এক রত্তি সোনাও আমাদের জন্যে সেখানে পড়ে নেই। শুনলে ওরা সবাই হাসাহাসি করবে বলে স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলি নি। জিওলজিক্যাল সার্ভের চিঠিখানা আমি

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। সোনার খনি আবিষ্কার করে ফেলেছি ভেবে দারুণ উত্তেজনা বোধ করলাম।

বাবু জাহেদ মামাকে বললো, 'কাল আপনার শিকার কী রকম হলো ?'

জাহেদ মামা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পাখি জাল কেটে বেরিয়ে গেছে। ধরা গেলো না।'

নেলী খালা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বার বার তো আর বেরিয়ে যেতে পারবে না। একবার ঠিকই ধরা পড়বে।'

জাহেদ মামা হেসে ফেললেন— 'তদ্দিনে আমার পাখি ধরার চাকরিটা থাকলে হয় আর কি।'

একবার ভাবলাম, গত রাতে আলো দেখার কথাটা জাহেদ মামাকে বলেই ফেলি। কিন্তু তাতে কি আসল অপরাধী ধরা পড়বে ? শ্রী গোবর্ধনরা যে আসল লোক নয়, এটুকু বুঝতে আর আমাদের বাকি নেই। বরং ওদেরক কিছু করলে আসল পাখি ঠিকই উড়ে পালিয়ে যাবে। তাছাড়া যখন ঠিক করেছি বড়োদের সাহায্য নেবো না, তখন দেখাই যাক না আমরা কি করতে পারি। এখনো তো তদন্তের কাজ শেষ হয় নি। আমি জাহেদ মামাকে বললাম, 'আপনাদের উল্টো দিকে যে ছাতিম গাছঅলা একটা পাহাড় আছে, ওখানে কখনো গিয়েছিলেন আপনি ? শুনলাম ওদিকে কোথায় যেন কোন এক পাকড়াশী থাকেন।'

জাহেদ মামা বললেন, 'শিকার করতে যখন এসেছি, তখন সব জায়গাতেই যেতে হয়েছে। ওই পাহাড়েই বুড়ো পাকড়াশীর খামার-বাড়ি রয়েছে। ভারি ভালো লোক। প্রচুর পয়সাও আছে। কক্সবাজারে আর হিমছড়িতে দুটো চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি চালাচ্ছেন। কলেজ আর হাসপাতালের জন্যেও মোটা টাকা ডোনেট করেছেন। ওঁর পোলট্রি থেকে আমাদের ডিম আর মুরগির বাচ্চা দেন; ভারি সস্তা। কেন, নেলীও তো ওঁর পোলট্রি থেকে ডিম কেনে !'

'পোলট্রিও আছে বুঝি !' টুনি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী গলায় বললো, 'আমার গ্রামের খামার-বাড়ি দেখার ভারি সখ। নিশ্চয়ই ষাঁড়, গরু এসবও আছে।' —এই বলে আড়চোখে ললির দিকে তাকালো। ললির আবার বৃষরাশি। কেউ ওর সামনে ষাঁড়-টাড়ের নাম করলে চটে যায়। ভাগ্যিস ও টুনির কথাটা খেয়াল করে নি। ও চুপচাপ নেলী খালার লেস বোনা দেখছিলো।

জাহেদ মামা হেসে বললেন, 'শুধু গরু কেন, ঘোড়া, গাধাও আছে। বুড়োর আবার এগুলো পোষার ভারি সখ। বলে— একা থাকি। ওরাই আমার বন্ধু।'

টুনি ফিক করে হেসে ফেললো— 'গাধার বন্ধু।'

ললি চোখ তুলে তাকালো, 'কে গাধার বন্ধু ?'

টুনি বললো, 'তোমাকে নয়, বাবুকে বলছি।'

বাবু বললো, 'তা তোমার বন্ধু হতে যে আমার আপত্তি নেই, একথা তো তোমাকে আগেই বলেছি।'

আমি হেসে বললাম, 'কেমন জব্দ হলে টুনি ?'

টুনি বললো, 'আমি কখনো জব্দ হই না।'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'জব্দ হতে হতে টুনি একেবারে জব্দ-প্রুফ হয়ে গেছে।'

টুনি এবার চটে গিয়ে বললো, 'দেখো বাবু, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না। ভালো হবে না বলছি !'

ললি বললো, 'তুমিই তো ওর সঙ্গে লাগতে গেলে টুনি !'

টুনি কী যেন ওকে বলতে যাচ্ছিলো, নেলী খালা বাধা দিয়ে বললেন, 'খাবার টেবিলে বসে বসে আর ঝগড়া করতে হবে না। আজ তোমরা সোনার খনি খুঁজতে যাবে না ?'

আমি বললাম, 'বিকেলে যাবো। এখন আমরা ঘরে বসে চাইনিজ চেকার খেলবো।'

জাহেদ মামা মৃদু হেসে বললেন, 'সুবোধ বালক।'

ঘরে ফিরে আমরা আমাদের তদন্তের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলাম। শ্রী গোবর্ধন আর মিস্টার ফতে যদি সারা দিন ঘরে বসে থাকে, তাহলে তো ওদিক দিয়ে এগুনো যায় না। আমরা ভাবছিলাম ওদের দু'জনের ঘর দুটো একবার সার্চ করে দেখবো। বিশেষ করে কাল রাতে, 'যাই গোবর' — বলে ফতে যে কোথায় উধাও হয়ে গেলো টেরই পেলাম না। ললি বলছিলো, পাশের ঘরে যেতে পারে। যেখানেই যাক, সৎ উদ্দেশ্যে যে যায় নি, সেকথা তো সবাই জানি। আর ফতে যাবার পর গোবর পাহাড়ে আর সমুদ্রে কাদের কাছে আলোর সংকেত পাঠালো ? রহস্যের যতো গভীরে ঢুকছি, গোটা ব্যাপারটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগলো।

ললি বললো, 'লরেল হার্ডির ওপর নজর রাখা যায় কীভাবে ?'

বাবু বললো, 'ওরা তো এমনিতেই নজরবন্দী হয়ে আছে।'

আমি মাথা নাড়লাম— 'পুরোপুরি নেই। ঘর থেকে যখন-তখন উধাও হয়ে যেতে পারে। অন্য কোথাও দিয়ে দিব্যি গুপ্তধনের নকশা খুঁজতে পারে। আমরা তো এগুলো দেখতে পাচ্ছি না।'

টুনি বললো, 'অন্য ঘরে ওদের যেতে না দিলেই হয়। সে-সব ঘরের দরজা যদি ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, তাহলে যাবে কী করে ?'

আমি বললাম, 'না টুনি, সেটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা তো চাই ওরা অন্য ঘরে যাক। নকশাটা কোথায়, খুঁজে বার করুক। তারপর আমাদের স্ক্যাটরাই নকশাটা ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে পারবে। আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের ওপর নজর রাখা।'

টুনি বললো, 'ওরা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলে আপনি নজর রাখবেন কী করে ?'

বাবু একটু ভেবে বললো, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। নেলী খালার কাছে কাঠমিস্ত্রিদের কাজ করার জিনিসপত্র সব আছে। আমরা যদি আমাদের কাঠের মেঝে দুটো ওপর থেকে ফুটো করে ফেলতে পারি, তাহলে ঘরে বসে ওরা কী করছে, এখান থেকে সব স্বচ্ছন্দে দেখা যাবে।'

বাবুর প্ল্যানটা আমাদের সবারই পছন্দ হলো। কাঠের পুতুল বানাবে বলে টুনি নেলী খালার কাছ থেকে যন্ত্রের বাক্সটা চেয়ে আনলো। নেলী খালা তখন জাহেদ মামার সঙ্গে এতো কথা বলছিলেন যে, চাওয়ামাত্র টুনিকে বাক্সটা নিতে বললেন। বাক্স আনার পর আমি বাবুকে বললাম, 'এবার দেখতে হবে, এই মুহূর্তে ওরা কোন ঘরে আছে।'

বাবু মেঝেতে কান পেতে শুনলো। বললো, 'দু'জনের গুজগুজ করে কথা বলা শুনে তো মনে হচ্ছে ওরা এ ঘরেই আছে।'

ললি বললো, 'মনে হচ্ছে কি, বলো এ ঘরে আছে।'

বাবু ঘাড় চুলকে বললো, 'কী জানি বাপু। হার্ডি তো আবার যখন-তখন উধাও হয়ে যেতে পারে। কখন হয়তো দেখবো, হঠাৎ এসে ওখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে টুনি পেছন ফিরে তাকালো। তারপর ছুটে গিয়ে বাবুকে একটা চিমটি কেটে বললো, 'আমাকে এভাবে ভয় দেখাতে বারণ করি নি ?'

আমি বললাম, 'ওরা এ ঘরে থাকলে আমরা পরম নিশ্চিন্তে ললিদের ঘর ফুটো করতে পারি।'

অসম্ভব প্যাঁচালো একটা তুরপুন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ললিদের ঘরের দু'মাথায় দুটো আর মাঝখানে একটা ফুটো করলাম। অবশ্য তিনটে ফুটো করতেই আমাদের দু'জনের ঝাড়া এক ঘণ্টা সময় লাগলো। ললি টুনি ও ঘরের মেঝেতে কান পেতে শুয়েছিলো, যদি

ওদের কথা শেষ হয়ে যায় আর ফতে যদি এ ঘরে ফিরে আসে সেটা শোনার জন্যে। অবশ্য এই এক ঘণ্টার ভেতর টুনি পাঁচ বার এসে শুধু বলেছে, 'কই হলো ?' আর প্রত্যেক বারই আমরা ঘাবড়ে গিয়েছি, ফতে বুঝি এই এসে পড়লো। শেষে বাবু ওকে ধমক লাগালো– 'কাজ শেষ হলে আমরাই যাবো। তুমি চুপচাপ তোমার কাজ করোগে। ফতে ঘর থেকে বেরুলেই শুধু খবর দেবে।'

চমৎকার তিনটে ফুটো বানিয়ে আমরা ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখলাম, দিব্যি সব দেখা যাচ্ছে। খাট, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, চেয়ারের ওপর ফতের কাদামাখা মস্তো বড়ো প্যান্টটা; সবই চোখে পড়লো। আমরা যখন কাজ শেষ করে ললি টুনিকে ডাকলাম, তখনো গোবর ফতের কথা শেষ হয় নি। টুনি দেখেই হাততালি দিয়ে বললো, 'কী মজা, ডান পাশের এই ফুটো দিয়ে আমি দেখবো।'

বাবু বললো, 'এবার আমাদের ঘরেও যে ক'টা ফুটো করা দরকার।'

আমি বললাম, 'ওরা না বেরুলে তো আর করা যাবে না। যখন খেতে যাবে, তখনই কাজ সেরে ফেলবো।'

তারপর টুনি চাইনিজ চেকারের বোর্ডটা আনলো। বললো, 'অনেক কাজ হয়েছে। এবার খেলা যাক।'

টুনি যখন চেকারের ঘরগুলো সব সাজালো, তখনই নেলী খালা এসে উঁকি মারলেন-- 'এখনো তোমরা খেলছো বুঝি ? তোমাদের জাহেদ মামা দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন। তোমরা তৈরি হয়ে নাও। জাহেদ আবার বেরুবে।'

বাবু বললো, 'লরেল হার্ডিও বুঝি আমাদের সঙ্গে খাবে ?'

নেলী খালা বললেন, 'ওরা পরে খাবে। আমি চাই না জাহেদের সামনে খেতে বসে শ্রী গোবর্ধন কোনো বাজে কাজ করে বসুক।'

নেলী খালা দুপুরে চমৎকার পাহাড়ী মোরগ রান্না করেছিলেন। খেয়ে-দেয়ে আমরা যখন ওপরে গেলাম, তখন বড়িবি ফতে আর গোবরকে ডাকতে গেলো। বুঝলাম, পুরো একটা ঘণ্টার আগে ওরা কেউ খাবার টেবিল থেকে উঠবে না। আমরা পরম নিশ্চিন্তে বসে আমাদের ঘরের মেঝে ফুটো করলাম। টুনি উঁকি মেরে দেখে বললো, 'ঘরের সবকিছু তো দেখা যাচ্ছে না। লরেলের এ ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজাগুলো কোথায় ?'

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, পাশের দেয়ালটা ঠিকই দেখা যাচ্ছে না। ফুটোটা একটু সরিয়ে করলে ভালো হতো। কিন্তু ততোক্ষণে এক ঘণ্টা কেটে গেছে। কারণ ঠিক তখনই 'হেউ হেউ' করে ঢেকুর তুলতে তুলতে ফতে আর গোবর ঘরে ঢুকলো।

বাবু বললো, 'এতেই চলবে, নইলে পরে আরো দুটো করে নেয়া যাবে। বিকেলের প্রোগ্রাম ঠিক করো।'

আমি বললাম, 'প্রোগ্রাম আর কি ! চলো সবাই মিলে আন্নাকালীর পাহাড়ে একবার ঢুঁ মেরে আসি।'

সত্যি বলতে কি, সেদিন ছাতিমতলায় অস্বাভাবিক মানুষটাকে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে দেখার পর থেকে আমি মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তারপর ফতে গোবরও সেই একই গাছের তলা থেকে উধাও হলো। ঝাঁকড়া মাথাঅলা মস্ত বড়ো ছাতিম গাছটা যেন আমার বুকের ভেতর শেকড় গেড়ে বসেছিলো।

সোজা পথে নয়, বাঁকা পথেই আমরা এগুলাম। অর্থাৎ হাটের ওপর দিয়ে না গিয়ে আমরা সোনাবালি নদীর তীর ধরে আন্নাকালীর পাহাড়ের দিকে এগুলাম। নদীর পানি বিকেলের সোনালি রোদে চকচক করছিলো। বাবু বললো, 'কবে যে এই নদীতে তাল তাল সোনা পাবো !'

টুনি বললো, 'তারপর তোমার পিঠে পুলিসের তাল তাল কিল পড়ুক।'

বাবু কোনো কথা না বলে নদীর কিনারের পানিতে হাত ডুবিয়ে এক মুঠো ভেজা বালি তুলে আনলো। বালির রঙও সোনালি। আমি বললাম, 'যত্ন করে রেখে দাও। ভরি খানেক সোনা নির্ঘাত পাবে।'

ললি মৃদু হেসে বললো, 'পাহাড়ে কোন দিক দিয়ে উঠবে ঠিক করো।'

বেশ খাড়া পাহাড়। অনেক খুঁজে একটা ঢালু খাঁজ বেয়ে উঠতে গিয়ে রীতিমতো খবর হয়ে গেলো। ফতে আর গোবরা এতো তাড়াতাড়ি কী করে উঠলো, ভেবেই পেলাম না। স্ক্যাটরার জিব বেরিয়ে গেলো, টুনি দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়লো, বাবুর পা মচকে গেলো আর ললি ওপরে উঠেই বললো, 'একটু না বসলে আমি আর হাঁটতে পারবো না। আমার বুকের ভেতর ব্যথা করছে।'

ডাক্তার ললিকে ছুটোছুটি করতে বারণ করেছে। ও পাহাড়ে উঠবে জানলে নিশ্চয়ই এটাও বারণ করতো।

আমরা একটা জায়গায় বসলাম। ছাতিম গাছটা আরেক ধাপ ওপরে। এখান থেকে শুধু গাছের ঘন সবুজ মাথাটা দেখা যাচ্ছে। দু'-একটা পাহাড়ী ঘুঘু ছাড়া বিকেলের আন্নাকালীর পাহাড়ে এতটুকু শব্দ ছিলো না। সামনের পাহাড়ে অনেক দূরে জাহেদ মামার লাল টালির বাংলো। নিচে সোনাবালি নদী। বিকেলের রোদে নদীটাকে মসৃণ চকচকে সোনালি সিল্কের ফিতের মতো মনে হচ্ছিলো। বাবু এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারলো। কিছুক্ষণ পর টুপ করে সামান্য একটু শব্দ হলো। তারপর আবার সব কিছু চুপচাপ। বাবু আরেকটা পাথব ছুঁড়লো।

টুনি বললো, 'আন্নাকালীর পাহাড়েই যখন এলাম, তখন সেই গাধার বন্ধুটাকে দেখে গেলে হতো না ?'

বাবু বললো, 'গাধার বন্ধু কে ?'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'আমি না, সেই বুড়ো পাকড়াশী— যার নাকি বিরাট এক খামার আছে।'

আমি বললাম, 'আমার মনে আছে টুনি। ছাতিমতলায় আন্নাকালীর মন্দির দর্শন করেই আমরা পাকড়াশী মশাইকে দর্শন করতে যাবো।'

আমার কথার ঢঙে সবাই হেসে উঠলো। কয়েকটা সবুজ টিয়ে পাখি গাছের ভেতর থেকে ঝটপট করে বেরিয়ে এসে আমাদের মুখের ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। একটা সবুজ পালক উড়ে এসে ললির হাতের কাছে পড়লো। কচি কলার পাতার রঙের মতো হালকা নরোম পালকটা ললি তুলে নিয়ে দেখলো। তারপর ওটা আমার হাতে বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'সুন্দর না !'

আমি হেসে বললাম, 'সুন্দর। তবে সুড়সুড়ি লাগছে।'

ললি লাল হয়ে গেলো। বাবু বললো, 'এবার ওঠা যাক। আন্নাকালীর মন্দির আর পাকড়াশীর খামার দেখে ফিরতে গেলে রাত হয়ে যাবে।'

বাবুটা এত চঞ্চল হয়ে পড়েছে কেন বুঝি না। এমনিতে ও অবশ্য বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। এতোক্ষণ শুধু নদীতে পাথর ছুঁড়ছিলো, আর ঘাসের কচি ডগা চিবোচ্ছিলো। আমি ললিকে বললাম, 'বুকের ব্যথাটা কমেছে ?'

ললি মাথা নাড়লো— 'কমেছে। চলো, রাত হলে আবার নেলী খালার বকুনি খেতে হবে।'

আমরা আরো কিছু দূর পাহাড় বেয়ে উঠলাম। একটু পরে ছাতিম গাছটা যেন আকাশ ফুঁড়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই ছাতিম গাছ, যেটা আমার বুকে শেকড় গেড়ে বসেছিলো। তেমন ভয়াবহ কিছু মনে হলো না। তবে গাছের নিচে একটুখানি ছায়া ছায়া

ফিকে অন্ধকার। তার ভেতর ছোট্ট একটা মন্দির। কয়েকটা বুনো লতা, মন্দির আর ছাতিম গাছের গোড়া পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

টুনি বললো, 'এতো ছোট মন্দির আমি আগে কখনো দেখি নি।'

বাবু বললো, 'এ মন্দিরে কোনো দিন পুজো হয়েছে, একথা কেউ বলতে পারবে না।'

টুনি বললো, 'পুজো হবে যে —মূর্তি কোথায় ?'

ললি বললো, 'আমার মনে হচ্ছে কাল রাতে ঠিক এখানেই আলো জ্বলতে দেখেছি।'

আমি ঘুরেফিরে সব দেখছিলাম। ছাতিম গাছটার বয়স যদি কেউ বলে পাঁচ শ' — তাহলে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। হঠাৎ গাছের গায়ে এক জায়গায় আমার চোখ দুটো চুম্বকের মতো আটকে গেলো। ফিসফিস করে বাবুকে ডাকলাম, 'দেখে যাও।'

ওরা তখনো মন্দির দেখছিলো। বাবুর সঙ্গে ললি টুনিও এলো। দেখে ওদের চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো হলো। টুনি বাবুর একটা হাত আঁকড়ে ধরলো। গাছের গায়ে ভয়ঙ্কর দেখতে একটা কঙ্কালের খুলি আঁকা। ধারালো কিছু দিয়ে খোদাই করে এঁকেছে।'

হঠাৎ স্ক্যাটরার গরগর শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। অচেনা কিছু দেখলে স্ক্যাটরা এরকম করে। এক জন বুড়ো— বয়স আশি বছরের কম হবে না, গুটিগুটি পায়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মন্দিরের দিকেই আসছিলেন। আমাদের দেখে অসম্ভব রকম অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'কাদের বাড়ির বাছা গো তোমরা ? এয়েচো কী কত্তে ? ওমা, এটা নেলীর সেই পাজি কুত্তোটা না ? আমার খামারের হাঁসগুলো ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। আমার কুত্তো খেঁদীও ওকে পছন্দ করে না।'

বুড়োর কথা শুনে বুঝলাম, ইনিই সেই পাকড়াশী মশাই, ভারি দয়ালু আর ভালোমানুষ বলে এ তল্লাটে যার খুব সুনাম। স্ক্যাটরা ওঁকে পছন্দ না করলেও আমি বিনীত গলায় বললাম, 'আমরা নেলী খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।'

একগাল হেসে বুড়ো পাকড়াশী বললেন, 'অ, তাই বলো। আমি ভাবলাম আর কেউ বুঝি। তা নেলী আমাকে বলেছিলো বটে তোমরা আসবে। আমি হলুমগে নিকুঞ্জ পাকড়াশী।'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'আমরা আপনাকে চিনি।'

ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো পিটপিট করে বুড়ো বললেন, 'চেনো মানে? তোমাদের সঙ্গে তো আমার আগে কখনো আলাপ হয় নি বাপু !'

আমি বললাম, 'জাহেদ মামার কাছে শুনেছি আপনার কথা। আপনার নাকি খুব দয়ার শরীর। নেলী খালার মালীকে দশটা টাকা দিয়েছিলেন। কক্সবাজারের কলেজ আর হাসপাতাল আপনার টাকায় চলে।'

টুনি বললো, 'আপনার একটা সুন্দর খামার আছে, তাও শুনেছি।'

বুড়োর পিটপিটে ভাবটা চলে গেলো। একগাল হেসে বললেন, 'তা বাপু লোকে একটু বাড়িয়েই বলে। জাহেদ ছোঁড়াটা আমাকে পছন্দ করে কিনা, তাই অমন বলেছে। তোমরা আমার খামার দেখবে ?'

টুনি বললো, 'বা রে , খামার দেখার জন্যই তো আমরা এসেছি !'

আমি দেখলাম বুড়ো পাকড়াশী টুনির কথা বলার মাঝখানে আড়চোখে ছাতিম গাছের গায়ে আঁকা সেই কঙ্কালের খুলিটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন ! চল বাছারা, খামারটা তোদের বেলা থাকতে দেখিয়ে আনি। সাঁঝে আবার এদিকে ঘোরাফেরা করা ভালো নয়।'

ললি এতোক্ষণে কথা বললো, 'কেন, ভূতের ভয় আছে নাকি !'

বুড়ো পাকড়াশী হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'তা বাছা তেনাদের ভূতই বলতে পারিস। হার্মাদদের আমলে ওরা যে কতো মানুষকে এসব পাহাড়ে জ্যান্ত পুঁতে রেখেছে, তার কি

কোনো ইয়ত্তা আছে ! তেনাদের কারো তো আর সদগতি হয় নি। তাই তেনাদের আত্মারা এখানো এখানে–সেখানে ঘুরে বেড়ান।'

টুনি ভয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আপনি মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছেন কেন ? আমরা তাহলে এক্ষুনি চলে যাবো।'

বুড়ো যেন জীবনে এমন হাসির কথা শোনেন নি। খিকখিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ওই দেখ, ভয় পাবার কী হলো এতে ! যতোক্ষণ সুয্যির আলো আছে, ততোক্ষণ কোনো ভয় নেই। তা ছাড়া আমি সঙ্গে আছি না !'

আমরা যখন পাকড়াশীর খামারে এলাম, সূর্য তখন পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। ছাতিম গাছের উল্টো দিকে বলে খামার থেকে জাহেদ মামার বাংলো দেখা গেলো না। পাকড়াশী আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। গাধা দেখে টুনি হেসে ফেললো। সেই সঙ্গে বাবুও।

সব দেখানোর পর পাকড়াশী বললেন, 'সাঁঝ হয়ে এলো। এবার তোরা বাড়ি যা বাছা। নে ধর, চাটগাঁ থেকে বেলা বিস্কুট এনেছিলাম, খেতে খেতে যা। খবদ্দার, ছাতিমতলা দিয়ে যাস নে। এতোক্ষণে তেনারা হয়তো বেরিয়ে পড়েছেন।' এই বলে বুড়ো পাকড়াশী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

পকেট ভর্তি বিস্কুট নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। কিছু দূর যাবার পর হঠাৎ মনে হলো অল্প দূরে সামনে থেকে কী যেন সরে গেলো। স্ক্যাটরা ঘেউঘেউ করে সে দিকে ছুটে গেলো। আর একটু পরেই শ্রী গোবর্ধন ঝোপের আড়াল থেকে তীরের বেগে আমাদের দিকে ছুটে এলো। পেছনে দেখি স্ক্যাটরাও মহা আনন্দে ছুটে আসছে। বাবু একটু সামনে ছিলো। গোবর্ধন এসে বাবুকেই জড়িয়ে ধরলো—' তোদের পায়ে পড়ি বাপ। কুত্তোটাকে ধর।'

আমি হাসি চেপে স্ক্যাটরাকে ধমক দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরা মাথা নিচু করে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগলো।

'তোকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা।'—এই বলে ফতেও আমাদের দিকে এগিয়ে এলো— তোর লজ্জাও করে না গোবর, কুত্তোর ভয়ে তুই একরত্তি ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরেছিস !'

ফতের বিশাল বপুর কাছে বাবুকে অবশ্য একরত্তিই মনে হয়। ফতে তখন আমার দিকে ফিরে মোলায়েম গলায় বললো, 'তোমরা বুঝি বেড়াতে এসেছো ? তা বেশ করেছো। বিকেলে পাহাড়ের বাতাস গায়ে লাগানো ভালো। তবে সন্ধের বাতাস ভালো নয়। সন্ধেবেলা নাম নিতে নেই— তেনারা একটু পরেই বেরিয়ে পড়বেন।'

আমি বললাম, 'আমরা পাকড়াশী মশাইকে দেখতে এসেছিলাম। আপনারা বুঝি সেখানে যাচ্ছেন ?'

'তা না— তা নয়।' আমতা আমতা করে ফতে বললো, 'আমরাও বেড়াতে বেরিয়েছি। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। এসে যখন পড়েছি, তখন যাই পাকড়াশী বাবুকে একটা সালাম দিয়ে আসি। চল গোবরা, পা চালিয়ে চল।'

গোবরা তো যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। আড়চোখে স্ক্যাটরার দিকে তাকিয়ে ওর দৌড়ানোর সাহস হলো না। নইলে ওর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিলো, স্ক্যাটরা সামনে না থাকলে ঠিকই বাঁইবাঁই করে ছুট লাগাতো। ফতের একটা হাত খামচে ধরে গোবরা দু' পা হাঁটে, এক বার পেছনে তাকায়। একটু পরে ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলো।

বাবু বললো, 'কী করবে, ফিরে যাবে, না ফতেরা ফেরা পর্যন্ত দাঁড়াবে ?'

ললি বললো, 'পাকড়াশীকে সালাম দেয়ার জন্যে ফতে হঠাৎ ক্ষেপে গেলো কেন বুঝলাম না।'

টুনি বললো, 'বারে, পাকড়াশী এখানকার নামকরা লোক। ওকে তো সবাই খাতির করবে।'

ললি বললো, 'ফতে গোবরকে আমরা খারাপ লোক বলেই জানি। পাকড়াশীর মতো ভালো লোককে ওরা কোনো বিপদেও ফেলতে পারে।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছো ললি। আমাদের উচিত ফতে গোবরাকে চোখে চোখে রাখা। ওদের প্রত্যেকটা কাজ সন্দেহজনক। চলো আবার পাকড়াশীর বাড়ির দিকে যাই।

টুনি একটু গাঁইগুঁই করে বললো, 'শেষে দেখো, দেরি করার জন্যে নেলী খালা না আবার বকা শুরু করে।'

বাবু তখন বললো, 'সে ভয় থাকলে এক্ষুনি তোমাকে রেখে আসতে পারি।' টুনি কথা না বলে বাবুকে শুধু একটু ভেংচি কেটে আমাদের সঙ্গে এলো।

গভীর বনে মড়ার খুলি

তখন চারদিকে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কালো অন্ধকার জমছিলো। আমরা দূর থেকে পাকড়াশীর ঘরের বারান্দায় আলো দেখতে পেলাম। বারান্দায় বসা পাকড়াশীকে ফতে আর গোবর হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছিল। মাঝে মাঝে পাকড়াশী ওদের ধমকে দিচ্ছিলেন।

হঠাৎ 'কেঁই কেঁই' করে বিচ্ছিরি গলায় ডাকতে ডাকতে পাকড়াশীর কুকুর খেঁদী বারান্দার দিকে ছুটে গেলো। বুঝলাম পাজি কুকুরটা আমাদের দেখে ফেলেছে। স্ক্যাটরা গরগর করে একটা হুঙ্কার ছাড়তে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলাম। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে খেঁদী আমাদের দিকে তাকিয়ে সমানে কেঁই কেঁই করতে লাগলো।

পাকড়াশী চেঁচিয়ে 'গদা, গদা' বলে কাকে যেন ডাকলেন। তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'গদা, দেখ তো খেঁদী এমন ভয় পেলো কেন ? নির্ঘাত শেয়াল-টেয়াল দেখেছে। শেয়ালের জ্বালায় হাঁস-মুরগির কারবার আমাকে গোটাতে হবে। নাকি চোর-ছ্যাঁচড় এলো— দেখ নারে গদা।'

শেয়াল দেখে কোনো কুকুর ভয় পায়— কথাটা আমি জীবনে প্রথম শুনলাম। খুব হাসি পেলো। কিন্তু হাসার বদলে আমাদের পালাতে হলো, কারণ ততোক্ষণে গদা নামধারী একটা দৈত্যের মতো লোক হেলেদুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো আর বলছিলো, 'শেয়াল নয় কত্তা, মানুষ।'

ভাগ্যিস এদিকটায় গাছপালা বেশি ছিলো বলে, গদা আমাদের চিনতে পারে নি। নইলে ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো আমাদের চার জনকে বগলদাবা করে পাকড়াশীর কাছে নিয়ে যেতে ওর দু' মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আর পাকড়াশী যে আমাদের গোয়েন্দাগিরি আদৌ পছন্দ করবেন না, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ওপর কথাটা যদি জাহেদ মামা আর নেলী খালার কানে একবার উঠিয়ে দেয়, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তাই আমরা

কোনো দিকে না তাকিয়ে সটান দৌড় দিলাম। কাউকে কিছু বলতে হয় নি। আমরা চারজন একই সঙ্গে ছুটছিলাম। স্ক্যাটরাও তাল মিলিয়ে সমানে ছুটলো। কিছুক্ষণ পর যখন মনে হলো নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছি, তখন আমরা থামলাম।

গদা'র— 'শেয়াল নয় মানুষ' শুনে পাকড়াশী এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যে, তখনো সেই চ্যাঁচানি আমাদের কানে বিঁধে ছিলো। ললি বললো, 'বাব্বা, পাকড়াশী মশাই এতো জোরে চ্যাঁচাতে পারেন !'

বাবু বললো, 'আমার মনে হচ্ছে কানের ভেতর বুঝি প্রজাপতি উড়ছে।'

টুনি ওদের কথায় কান না দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'ললিপা তোমরা কোথায় এসেছো? আমার ভয় লাগছে।'

টুনির কথা শুনে বাবু ধমক দিতে যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই স্ক্যাটরা এমন ভাবে গরগর করে উঠলো যে, বাবু টুনিকে কিছু বলার সুযোগ পেলো না। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই স্ক্যাটরা এভাবে শব্দ করে। তখন ওর ঘাড়ের কাছের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায়। টুনি ললির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমরা চারপাশে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ খেয়াল হলো গদার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমরা উলটো পথে দৌড়েছিলাম। ফিরে যেতে হলে আমাদের আবার পাকড়াশীর বাড়ির ওপর দিয়েই যেতে হবে। এদিকটায় গাছপালা বেশ ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। আকাশে তখনো শেষ সন্ধ্যার কিছু ম্লান আলো মেঘের ফাঁকে ছড়িয়ে ছিলো। কিন্তু গাছের নিচে অন্ধকার ভালো রকমই জেঁকে বসেছে।

কিছুক্ষণ গরগর করে স্ক্যাটরা থেমে গেলো। ওর ঝোলা কান দুটোকে যতোখানি খাড়া করা সম্ভব, তার চেয়ে বেশি খাড়া করে কোনো অচেনা শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। আমরা কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে স্ক্যাটরার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে স্ক্যাটরা আবার গরগর করে শব্দ করলো। বেশ কিছু দূরে ঝোপঝাড়ের ভেতরে একটা পুরোনো সেগুন গাছের দিকে ও তাকিয়ে ছিলো। মনে হলো সাদা মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। স্ক্যাটরাকে আমি ইশারায় থামিয়ে দিলাম। বাবু ললি টুনি একসঙ্গে আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কোনো কথা না বলে ওদের ঝোপটার দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

কিছুক্ষণ পর ওরাও দেখতে পেলো। টুনির অবস্থা দেখে মনে হলো ও বুঝি ফিট হয়ে যাবে। আমি ওর হাতটা ধরে টের পেলাম— ঠকঠক করে কাঁপছে।

আমি ওর কানে ফিসফিস করে বললাম, 'ভয় কি টুনি! আমি আছি, বাবু আছে। তাছাড়া স্ক্যাটরা একাই তো এক শ'।'

টুনির কাঁপুনি কমলো। তবে ললি কতটুকু ভয় পেয়েছে সেটা বোঝা গেলো না। বাবু ওর কাঁধে হাত রেখেছিলো। স্ক্যাটরার ভাবসাব দেখে মনে হলো ইশারা পেলে ও ঝোপটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আচমকা আমাদের চোখের সামনে সাদা বস্তুটা একটা লম্বা মানুষ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম, পরশু সন্ধেয় যখন জাহেদ মামার বাংলো থেকে ফিরছিলাম, তখন কি এই লোকটাকেই দেখেছিলাম? লোকটা লম্বায় আট ফুটের কম হবে না। চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা আলখাল্লায় ঢাকা।

দু'হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে টুনি তোতলাতে লাগলো— 'ভূ-ভূ-ভূত!'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'না মানুষ। এটাকেই সেদিন ছাতিমতলায় দেখেছিলাম।'

ললি ফিসফিস করে বললো, 'এতো লম্বা মানুষ!'

বাবু বললো, 'হতে পারে। হার্মাদরা তো এদেশী মানুষ নয়। আফ্রিকায় কোথায় যেন আট ফুট লম্বা মানুষ থাকে।'

বাবুর যুক্তি শুনেও টুনির ভয় গেলো না। আমিও কম ভয় পাই নি। তবে এখন ভয় পেলে যে টুনিকে সামলানোই দায় হবে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'লোকটাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। দেখি ও কী করতে চায়।'

এমন সময় স্ক্যাটরা আবার গরগর করে উঠতে যাচ্ছিলো। ওকে চাপা গলায় ধমকে দিলাম। সেই লোকটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা গভীর বনের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। আমরাও সমান দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করলাম। স্ক্যাটরা সঙ্গে ছিলো বলেই সেদিন এরকম সাহস দেখাতে পেরেছিলাম।

লোকটাকে প্রথম যেখানে দেখছিলাম, সেই সেগুন গাছটার কাছে আসার পর হঠাৎ ওকে হারিয়ে ফেললাম। চোখের পলকে লোকটা কর্পূরের মতো উবে গেলো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। তবু বনের ভেতর বেশ অন্ধকার। সাদা কাপড় পরা না থাকলে দশ হাত দূরের কাউকেও দেখা যেতো না। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম।

আমি টের পাচ্ছিলাম, টুনি এসব বাজে কাজের চেয়ে ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেগুন গাছের তলায় এসে বাবু বললো, 'লোকটা এখানে বসে এতোক্ষণ কী করছিলো?'

আমি একটু হেসে বললাম, ' তোমার কথা মতো যদি হার্মাদ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই গুপ্তধন পুঁতে রেখেছে।'

টুনি বিরক্ত হয়ে বললো, 'এটা কি ঠাট্টা করার সময়! চলুন ফিরে যাই।'

আমি বললাম, 'একা যেতে পারবে?'

টুনি তক্ষুনি আমার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলো। আমি বললাম, 'তাহলে বারবার যাওয়ার কথা বলবে না।'

গুরুতর কিছু ঘটতে দেখলে ললি সব সময় গম্ভীর হয়ে যায়। ও আস্তে আস্তে বললো, 'লোকটা কোথায় গেলো দেখলে হতো না?'

টুনি ললিকে ধমকে বললো, 'তুমিও বুঝি ওদের দলে ঢুকলে ললিপা?'

ললি ভয় পায় নি দেখে আমার খুব ভালো লাগলো।

বাবু সত্যি সত্যিই গুপ্তধন খোঁজার জন্যে সেগুন গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। হঠাৎ চাপাগলায় আমাকে বললো, 'আবির, দেখে যাও জলদি।'

আমরা তিন জন ওর কাছে ছুটে গেলাম। বাবু বললো, 'দেখ, মড়ার খুলি।'

চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় দেখলাম, সেগুন গাছের গায়ে একটা কঙ্কালের মাথার খুলি আঁকা রয়েছে। আমি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম। একটু ভেজা ভেজা মনে হলো। শুঁকে দেখলাম তাজা সেগুন কাঠের গন্ধ। বললাম, 'লম্বু তাহলে এতোক্ষণ বসে বসে এটাই আঁকছিলো।'

ললি শুকনো গলায় বললো, 'তবে যে বাথিন বলছিলো মড়ার খুলি হার্মাদদের আমলের আঁকা।'

বাবু বললো, 'আমিও তো তাই বলছি। এই লোকটা নির্ঘাত হার্মাদদের কেউ হবে। নইলে এতো লম্বা হয় কী করে!'

আমি বললাম, 'চৌদ্দ পুরুষ আগে ওর কেউ হার্মাদ থাকতে পারে। তবে রণ-পা পরে তুমিও ওর মতো লম্বা হতে পারো বাবু।'

বাবু বললো, তুমি কী করে বুঝলে ও রণ-পা পরেছে?"

আমি বললাম, 'ওর হাঁটার ধরন দেখেই বোঝা যায়। আমি এক বার সার্কাসে দেখেছিলাম একটা জোকার রণ-পা পরে কিভাবে হেঁটেছিলো।'

টুনি ভয়-টয় ভুলে অবাক হয়ে বললো, 'রণ-পা কী আবির?'

আমি পাণ্ডিত্য ফলানোর জন্যে ধীরেসুস্থে বলতে আরম্ভ করলাম, 'রণ-পা হলো—'

বাবু বাধা দিয়ে বললো, 'এক ধরনের বাঁশের পায়ের মতো। দুটো বাঁশের গিঁটে পা রেখে পা-টা লম্বা করে নেয়। তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় এতে।'

ললি বললো, 'ভয়ও দেখানো যায়।'

আমি একটু হাসলাম— 'ললি কি ভয় পেয়েছো?'

ললি কথার জবাব দেয়ার আগে বাবু বললো, 'তুমি কী করে বুঝলে যে এই খুলিটা ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ আঁকে নি?'

আমি বললাম, 'সেগুন কাঠের তাজা গন্ধ বেরুচ্ছে। তাছাড়া ভেজাও রয়েছে। দু' শ' বছর আগের আঁকা কোনো মড়ার খুলি থেকে তাজা সেগুন কাঠের গন্ধ বেরুবে না।'

টুনি হাঁপ ছেড়ে বললো, 'তাই বলো। আমি তো ভয়েই মরি, সত্যিই বুঝি লোকটা তখনকার দিনের কোনো প্রেতাত্মা হবে।'

ললি গম্ভীর হয়ে বললো, 'তা তো বুঝলাম, লোকটা প্রেতাত্মা নয়— মানুষ। বাথিন আমাদের মিছে কথা বলেছে। কিন্তু লোকটা রণ-পা পরেই বা কেন ঘুরছে, আর কেনই বা সেগুন গাছের গোড়ায় মড়ার খুলি আঁকছে!'

বাবু বললো, 'হয়তো কোনো গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে এখানে।'

টুনি বললো, 'তুমি কি বলতে চাও, যতগুলো গাছে এরকম মড়ার খুলি আঁকা রয়েছে, ততগুলো গাছের নিচে লোকটা গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে?'

বাবু বিরক্ত হয়ে বললো, 'আহ্, সব সময় তর্ক করো কেন টুনি! এমনও তো হতে পারে, লোকটা কোনো গুপ্তধন খুঁজছে। যে-সব গাছের নিচে খোঁজা শেষ হয়েছে, হয়তো লোকটা সে-সব গাছে চিহ্ন দিয়ে রাখছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তর্ক করো না টুনি। বাবুর মাথায় গুপ্তধনের ভূত চেপেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে?'

ললি বললো, 'আর মড়ার খুলিই বা কেন আঁকছে?'

আমি বললাম, 'গুপ্তধন হোক বা অন্য কিছুর জন্যে হোক, কিছু গাছ চিহ্ন দিয়ে আলাদা করে রাখছে। মড়ার খুলি আঁকার আরেকটা উদ্দেশ্য হতে পারে স্রেফ ভয় দেখানো।'

টুনি বললো, 'এ মা! লোকটা কী পাজি!'

আমি হাসলাম— 'ভালো যে নয় আমি হলপ করে বলতে পারি। এই জঙ্গলে রাতের বেলা এভাবে ভয় দেখিয়ে কোনো ভালো লোক নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াবে না।'

টুনি বললো, 'আমার কিন্তু এখনো ভয় লাগছে।'

বাবু ধমক দিয়ে বললো, 'আবার ভয়ের কথা—' শেষ না করেই বাবু তিন লাফে আমার কাছে ছুটে এসে — 'ওরে বাবা ওটা কি!'— বলে ভয়-টয় পেয়ে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসলো। সুযোগ পেয়ে স্ক্যাটরাও ঘেউ ঘেউ করে বার দুই ডেকে নিলো। আর টুনি কাঁদো কাঁদো গলায় 'ললিপা, দেখ না আমাকে কেন মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছে' বলে নাকীকান্না জুড়ে দিলো।

আমি দিশেহারা হয়ে প্রথমে বাবুকে ধমক দিলাম, তারপর স্ক্যাটরা আর টুনিকে। বাবুকে বললাম, 'কী দেখেছো বলবে তো!'

বাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'আমার পায়ের ওপর দিয়ে কী যেন ছুটে গেলো। আমি—' কথা শেষ না করে আরেক লাফে বাবু ললির কাছে চলে গেলো।

বাবুর ভয়ের কারণটা দেখলাম। আমার হাসি চাপা দায় হয়ে পড়লো। দুটো কাঠবেড়ালীর ছুটোছুটিতে ও যদি এভাবে ভয় পায়, তাহলে আমি কোথায় যাই! কাঠবেড়ালী দেখে ললিও হেসে বললো, 'ও তো কাঠবেড়ালী বাবু। ভয় পাচ্ছো কেন?'

তবে এরকম কাঠবেড়ালী আমি আগে কখনো দেখি নি। একেবারে কুচকুচে কালো দেখতে। ছোট চোখ দুটো চাঁদের আলোয় হীরের কণার মতো চকচক করছে।

বাবু হাঁপ ছেড়ে বললো, 'তাই বলো। আমি ভাবি আর কি যেন!'

এমন সময় বেশ দূরে একটা নারকেল গাছের দিকে তাকিয়ে স্ক্যাটরা আবার আগের মতো গরগর করে উঠলো। আমরা চার জন চমকে উঠে একসঙ্গে তাকিয়ে দেখি, সেই লম্বা লোকটা। স্ক্যাটরাকে কিছু বলার আগেই ও ঘেউ ঘেউ করে লোকটার দিকে ছুটে গেলো। আর স্ক্যাটরার সেই বন-কাঁপানো, পিলে চমকানো ডাক শুনে লোকটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আট ফুট লম্বা লোকটার বদলে খুবই সাধারণ একটা লিকলিকে শরীরের লোক লাফ দিয়ে উঠে ছুটে পালাতে পালাতে চেঁচিয়ে বললো, 'ওরে বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে! ওরে ফতে, ওরে পঁচারে! তোরা আমাকে ফেলে কোথায় গেলিরে!' চোখের পলকে আমাদের পরিচিত শ্রী গোবর্ধন অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

আমরা চার জন একে অপরের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। লোকটাকে ওভাবে ছুটে পালাতে দেখে স্ক্যাটরাও ফিরে এলো। গলার স্বরটা স্ক্যাটরার কাছেও অচেনা নয়। ললি বললো, 'শ্রী গোবর্ধনই তাহলে এতোক্ষণ রণ-পা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো!'

বাবু উত্তেজিত গলায় বললো, 'ফতে আর পঁচা নামের কেউ নিশ্চয় ওর সঙ্গে আছে।'

ললি বললো, 'কিন্তু ওরা এখানে কী করছে, সেটাই তো জানা গেলো না।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আজ রাতে সব জানা যাবে। আজ রাতেই—'

আমার কথা শেষ না হতে স্ক্যাটরা আবার গরগর করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি, চিমনি-ঢাকা বাতি হাতে তিনটে লোক আমাদের দিকে আসছে।

বাবু ফিসফিস করে বললো, 'ফতেরা আসছে।'

আমি চাপা গলায় ওদের সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'চুপ। কোনো কথা নয়। পাশের ঝোপটার ভেতরে ঢুকে পড়ো।'

স্ক্যাটরাকে নিয়ে আমরা চার জন পাশের কেয়া গাছের ঝোপটার ভেতর ঢুকে পড়লাম। ওরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলো। কথা ঠিক নয়, ফতে সারাক্ষণ গোবরকে ধমক দিচ্ছিলো— 'ওই কুত্তোই তোকে খাবে। আজ যদি বড়ো কত্তাকে না বলেছি, তাহলে আমার নামে যেন লোকে সাতটা নেড়ি কুত্তো পোষে। শেষ কালে খেঁদীর ডাক শুনে তুই ভয় পেতে শুরু করলি? তোকে নিয়ে কী করে চলবে র‍্যা!'

গোবর মিনমিন করে বললো, 'মা কালীর দিব্যি ওস্তাদ। ওটা খেঁদী নয়। ওই ছোঁড়াগুলো যেটাকে নিয়ে ঘোরে, সেটা।'

ফতে বললো, 'তোর মুণ্ডু।' তারপর গলা তুলে আদর করে ডাকলো, ' খেঁদী, খেঁদী! কোথায় গেলি বাছা। রাতে-বিরেতে বাইরে কেন ঘুরছিস? খেঁদী!' কোনো সাড়া না পেয়ে ফতে ক্ষেপে গিয়ে বললো— 'কোথায় গেলো হারামজাদা কুত্তোটা!'

আমাদের ঝোপটার প্রায় গা ঘেঁষে ফতেরা বেরিয়ে গেলো। স্ক্যাটরার গলাটা যে চ্যাঁচানোর জন্যে কী রকম নিশপিশ করছে, বুঝতে এতোটুকু অসুবিধে হলো না। খেঁদী হলে এতোক্ষণে কী করতো জানি না, তবে স্ক্যাটরার মতো ভালো কুকুর আর হয় না।

ফতেদের আলোটা বনের ভেতর হারিয়ে যাবার পর টুনি বললো, 'ললিপা, ফিরে চলো।'

ললি আমাকে বললো, 'আবির কি আরো থাকতে চাও?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'ঠিক আছে ফিরে চলো।'

যেতে যেতে ললি বললো, 'নেলী খালা এতোক্ষণে নিশ্চয় আমাদের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।'

বাবু বললো, 'তবে নেলী খালা এটাও জানেন যে, স্ক্যাটরা আমাদের সঙ্গে আছে।'

ভাঙা চাঁদটা আরেকটু ওপরে উঠে এসেছে। বনের ভেতরটা অদ্ভুত রকম সুমসাম। দূরে কয়েকটা পাখির ডানা ঝাপটানো শুনতে পেলাম। কোথাও কোন নাম-না-জানা ফুল ফুটেছে। অচেনা মিষ্টি বুনো গন্ধে বাতাসটা ভারি হয়ে আছে। আমরা চার জন চুপচাপ হাঁটছিলাম। পায়ের নিচে শুকনো পাতার খসখস শব্দ হচ্ছিল। খেয়াল করলাম কেউ কোনো কথা বলছে না। মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে, যখন অনেক কথা বলার থাকলেও কিছুই বলা হয় না। এতোক্ষণ প্রচণ্ড এক উত্তেজনার সময় কাটানোর পর আমাদের অবস্থাও সে রকম হয়েছিলো।

বাবু হাঁটতে হাঁটতে একসময় বললো, 'আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো আবির?'

আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। দূরে পাহাড়ের নিচে সোনাবালি নদী চাঁদের আলোয় চিকচিক করছিলো। আমি একটু হেসে বললাম, 'নদী পেয়েছি, পথ চিনতে অসুবিধে হবে না। হয়তো একটু বেশি ঘুরতে হতে পারে।'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'হাঁটতে আমার ভালোই লাগছে।'

আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'আমারও।'

বাবু বললো, 'মড়ার খুলির রহস্যটা কিছুই বোঝা গেলো না আবির। তুমি কি কিছু ভাবছো?'

আমি বললাম, ' ভেবেছি। আজ রাতে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। হয়তো সবই জেনে যাবো। জাহেদ মামার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো।'

বাবু একটু হেসে বললো, 'গিয়ে দেখবে, নেলী খালা আর জাহেদ মামা বসে গপ্পো করছে।'

টুনি মুখ টিপে হেসে বললো, 'তাহলে তো বেঁচে যাই।'

ললি বললো, 'তুমি খুব পাজি হয়েছো টুনি।'

আমি টুনিকে নিয়ে একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাবু বললো, 'নদীতে ওগুলো কী, দেখ তো আবির।'

স্ক্যাটরাও গরগর করে উঠলো। ওকে একটা ধমক দিয়ে নদীতে তাকিয়ে দেখি অনেকগুলো মোষের মতো জন্তু সারি বেঁধে পানি খাচ্ছে।

টুনি বললো, 'গরুই তো মনে হচ্ছে।'— বলে আড়চোখে একবার ললির দিকে তাকাতে ভুললো না।

আমরা আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। বাবু উত্তেজিত গলায় বললো, 'গরু নয়, বাইসন। আমি ওয়াইল্ড ওয়েস্টের ছবিতে এরকম বাইসন দেখেছি।'

ভালো করে বাবুর বাইসনগুলো দেখে আমি পাণ্ডিত্য ফলানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম। বললাম, 'বাইসন নয় বাবু। এগুলো হচ্ছে নীল গাই। হিল ট্র্যাক্টের জঙ্গলে এক সময় প্রচুর নীল গাই পাওয়া যেতো। বাবা অনেক নীল গাই শিকার করেছেন। আজকাল অবশ্য খুব কমই দেখা যায়।'

টুনি বললো, 'সত্যি বলছেন এগুলো নীল গাই! কী মজা ললিপা! স্কুলে গিয়ে নীল গাইর গপ্পো করা যাবে।'

আমি বললাম, 'কেন, কালো কাঠবেড়ালী যে দেখলে, সেটা তো আরো দুর্লভ।'

বাবু বললো, 'লরেল হার্ডিই বা কম কিসে! গোবর যা দেখালো— আমি তো কোনো দিনই ভুলবো না।'

আমি বললাম, 'পা চালিয়ে চলো সবাই। নীল গাইরা মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে তাড়া করে। তখন এরা বাইসনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।'

টুনি শুকনো গলায় বললো, 'আপনি খালি ভয় দেখাতে পারেন।'

বাকি পথটা আমরা সবাই মিলে দৌড়ে পার হলাম। শেষের দিকে অবশ্য খুবই আস্তে হাঁটতে হয়েছে, কারণ ললির বুকের ব্যথাটা আবার বেড়েছিলো। আমরা যখন ঘরে ফিরলাম, ঘড়িতে তখন আটটা বাজে।

নেলী খালা গাড়ি বারান্দার নিচে পায়চারি করছিলেন। স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে ওঁকে আদর করতেই এক ধমক লাগালেন— 'থাক থাক, ওসব শুকনো আদর দেখাতে হবে না।'

আমি ভাবলাম, এ সময়ে জাহেদ মামার থাকাটা খুব দরকার ছিলো। নেলী খালা রীতিমতো রেগে গেছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে নেলী খালা বললেন, 'বেড়াতে তো কাউকে আমি বারণ করি নি। জাহেদ বলে গেলো ওর দুটো লোককে কারা যেন খুন করে সমুদ্রের তীরে ফেলে রেখেছে। বেচারা জাহেদ হিমছড়ি আর কক্সবাজার ছুটোছুটি করে মরছে। আমি একা কত জনের কথা ভাববো!'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'বলো কি নেলী খালা! কারা খুন করলো?'

নেলী খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ' সেটা যদি কেউ জানতো, তাহলে জাহেদকে এতো ছুটোছুটি করতে হতো না। আমি শুধু শুনেছি দুটো খুন হয়েছে, আর লাশ দুটোর পাশে বালিতে দুটো মড়ার খুলি আঁকা রয়েছে।'

আবার মড়ার খুলি! তার মানে গোবররা কি খুনের সঙ্গেও জড়িত? গভীর উত্তেজনায় আমাদের সবার চোখ চকচক করছিলো। বাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। নেলী খালা বাধা দিয়ে বললেন, 'আর কোনো কথা নয়। এক্ষুনি খেয়ে শুতে যাও।'

আমরা যখন রাতের খাবার খেয়ে ওপরে উঠতে যাবো, তখনই ফতে গোবর এসে ঘরে ঢুকলো। নেলী খালার পাশে স্ক্যাটরাকে দেখে গোবর ফতের একটা হাত আঁকড়ে ধরলো। নেলী খালা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনারা খেয়ে নিন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সঙ্গে বসতে পারছি না।'

গোবর বললো, 'তাতে কি, তাতে কি! তবে কুত্তোটাকে দিদি আপনার সঙ্গে না নিয়ে গেলে একটা ভাতও গিলতে পারবো না।'

দোতালায় এসে ঘরে ঢুকে আমি বাবুকে বললাম, 'আজ রাতেই একটা কিছু ঘটবে।'

বাবুর দু'চোখে তখন ঘুমের জোয়ার নেমেছে। ঘুম-জড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বললো, 'কী ঘটবে?'

আমি বললাম, 'বোসো। এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

এতো বড়ো প্ল্যানটা একটু ভূমিকা ছাড়া কীভাবে বলা যায় আমি ভেবে পেলাম না। বাবু বিরক্ত হয়ে বললো, 'তুমি সারারাত ধরে বসে বসে ভাবো।' বলেই পাশ-বালিশটা টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বাবুর ওপর আমার খুব রাগ হলো। আমি ভাবছিলাম ফতে গোবরকে আজ রাতে অনুসরণ করবো। ললির বুকের অসুখটা আবার বেড়েছে বলে ও খাবার পরই ঘরে চলে গেছে। টুনিও নিশ্চয় এতোক্ষণে আলো দেখবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাবু, ললি, টুনি সব কটাকে দারুণ স্বার্থপর মনে হলো। মনে মনে ঠিক করলাম, আগামী তিন দিন বাবুর সঙ্গে কথাই বলবো না।

আরও কিছু সূত্র

বাবুদের স্বার্থপরতার কথা ভেবে যখন সব কিছু অসার মনে হচ্ছিলো, ঠিক তখন দেখি নেলী খালা পা টিপে টিপে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি অমন করে হাঁটছো কেন নেলী খালা? পায়ে কি কিছু বিঁধেছে!'

নেলী খালা ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ!' তারপর কাছে এসে বললেন, 'আমার ঘরে চল। একটা জিনিস দেখাবো।'

আমি অবাক হয়ে নেলী খালাকে অনুসরণ করলাম। নেলী খালা আবার কখন থেকে আমাদের মতো গোয়েন্দাগিরি শুরু করলেন, ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না।

নেলী খালার মতো পা টিপে টিপে নিচে এসে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই আমার চোখ দুটো কপালে উঠে গেলো, আর মুখটা হাঁ হয়ে গেলো। কী বলবো কিছুই ভেবে পেলাম না। চোখের সামনে দেওয়ালের মিটমিটে আলোর নিচে ভাইয়া হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? কথা বল। তুই তো দেখছি আমার চেয়েও লম্বা হবি!'— বলতে বলতে ভাইয়া এগিয়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি কথা না বলে শুধু ভাইয়াকেই দেখছিলাম। নেলী খালা গত বছর জিনসের যে নীল ট্রাউজারটা ভাইয়ার জন্যে এনেছিলেন, সেটাই তার পরনে। গায়ে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। ভাইয়া দাড়ি রেখেছে। দাড়ি রাখলে যে কাউকে সুন্দর লাগতে পারে, ভাইয়াকে দেখার আগে কোনো দিনই কথাটা আমি বিশ্বাস করতাম না।

আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছো ভাইয়া? কোথায় থাকো? কী করছো?'

ভাইয়া হেসে বললো, 'আস্তে আস্তে। খুব ভালো আছি। কোথায় থাকি, কী করে বলি! বলতে পারিস সারা বাংলাদেশেই আছি। কী করছি, এক কথায় কি আর বলা যাবে? বরং কখনো নেলী খালার কাছে শুনিস আমরা কী করছি। তোদের কথা বল। তুই তো ফার্স্ট হবি আমি জানি। মা-বাবা কেমন আছেন রে?'

আমি বললাম, 'ভালো। তোমার প্রথম চিঠি পড়ে মা কেঁদেছিলেন। আগে খুব কাঁদতেন। এখন আর কাঁদেন না।'

ভাইয়া বললো, 'না কাঁদলেই বাঁচি। কাল তোকে হাটে দেখেছিলাম। সঙ্গে ওরা ছিলো বলে ডাকি নি। মনে হচ্ছে নতুন জায়গাটা তোদের খুব ভালো লেগে গেছে।'

আমি বললাম, 'ভালো আর বলতে! এত সুন্দর জায়গার কথা আমি ভাবতেই পারি না।'

ভাইয়া মুখ টিপে হেসে রহস্য করে বললো, 'প্রদীপের নিচেই যে অন্ধকার।'

'অন্ধকার কোথায় দেখলে ভাইয়া!' আমি অবাক হলাম।

'আগে বল, সেদিন নদীর পানিতে সবাই মিলে কী খুঁজছিলি?'

আমি নেলী খালার দিকে তাকালাম। নেলী খালা লাজুক হেসে বললেন, 'তোমাকে বলি নি অপু। আমার ধারণা, এ নদীর কাছাকাছি কোথাও সোনার খনি আছে। আমি নদীর বালুর সঙ্গে সোনার গুঁড়ো পেয়েছি।

'বলো কী নেলী খালা! এমন একটা জিনিস তুমি এদ্দিন চেপে ছিলে?'

'না, না। আমি এখনো পুরোপুরি শিওর নই।' নেলী খালা বললেন, 'জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেন্টকে চিঠি লিখেছি। ওরা একটা সার্ভে টীম পাঠিয়েছে। ওদের একটা জার্নালে পড়েছি। মনে হচ্ছে হিল ট্র্যাক্টে সোনা পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।'

নেলী খালার কথা শুনতে শুনতে কী যেন ভাবছিলো ভাইয়া। চিন্তিত গলায় বললো, 'এখন মনে হচ্ছে একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের সূত্র?'

'বলছি।' নেলী খালার দিকে তাকালো ভাইয়া— 'পাকড়াশীকে তোমার কেমন মনে হয় বলো তো?'

'নিকুঞ্জ পাকড়াশীর কথা বলছিস? কেন, ভালোই তো!'

'কী রকম ভালো?' ভাইয়া রহস্যময় হাসলো।

'আমি বাড়ি কেনার পর নিজে এসে দেখা করে গেছেন। প্রথম দু'দিন রান্না করে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব সময় লোকজন পাঠিয়ে খোঁজখবর নেন। এক বার অবশ্য বলেছিলেন, 'এ বাড়িটার ভীষণ বদনাম। কিনে ভালো করি নি। এখনো নাকি কী সব আশরীরী আত্মা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এক জন ওয়েল উইশারের মতো বাড়ির কাজের লোকজনদেরও সাবধান করে দিয়েছেন। আমি ওতে কান দিই নি। পুরোনো দিনের লোকজন এসব বলেই থাকে।'

'তার সম্পর্কে তোমার আর্মি অফিসার বন্ধুর কী ধারণা?'

একটু লাল হয়ে নেলী খালা বললেন, 'জাহেদ বলেছে, কক্সবাজার আর হিমছড়িতে নাকি দুটো চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি চালান পাকড়াশী মশাই। নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় লোক। বড় খামার আছে একটা। একা মানুষ। খামারে প্রচুর আয় হয়। তাই দান-খয়রাতের সুযোগ পেলে ছাড়েন না।'

'হুঁ।' গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লো ভাইয়া। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'পাকড়াশীকে তোমরা যতোটা ভালো বলে জানো, আমরা তা মনে করি না।'

নেলী খালা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খারাপ কী দেখলে?'

মৃদু হেসে ভাইয়া বললো, 'এটা তো স্বীকার করবে, তোমার আর জাহেদ সাহেবের চেয়ে এই এলাকাটা আমি বেশি চিনি?'

'তাতে কী হলো?'

'পাকড়াশীকে আমরা প্রথম থেকেই সন্দ করছি। জায়গাটার ন্যাচারাল বিউটি দারুণ। তবে এত বড় একটা খামার চালাবার জন্যে মোটেই সুবিধের নয়। তুমি নিজেই তো ভেজিটেবলের ব্যবসা করতে গিয়ে গচ্চা দিলে। কক্সবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। টেকনাফ বা উখিয়ার অবস্থাও এর চেয়ে ভালো। তবু সেখানে এ ধরনের কোনো খামার নেই। অথচ এখানে এত বড় একটা খামার ফেঁদে বসার তাৎপর্যটা কী— এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়েছে।'

'হয়তো জায়গাটা পাকড়াশীর কোনো কারণে ভালো লেগেছে। যেমন আমার লেগেছে। এতে সন্দ করার কী আছে?'

'পাকড়াশী তোমার মতো এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় নয় নেলী খালা। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল লোক। পাকড়াশীর এখানে আসার পর অচেনা লোকের আনাগোনা অনেক বেড়েছে। আমাদের কাজ করতে হয় স্থানীয় লোকদের সঙ্গে। ওদেরও অনেকের ধারণা, এখানে থাকার

পেছনে পাকড়াশীর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। এখানকার লোকজন এত ভালো যে, মানুষ খুন করা দূরে থাক, সামান্য চুরি পর্যন্ত করে না। অথচ পাকড়াশী আসার পর বেশ কয়েকটা লোক খুন হয়েছে।'

'তোর যুক্তি মোটেই জোরালো মনে হচ্ছে না অপু।' মাথা নেড়ে নেলী খালা বললেন, 'আমাকে যারা ভূতের ভয় দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়, হয়তো তারাই পাকড়াশীকে নিয়ে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। তুই যেভাবে বলছিস, সেভাবে তো বুড়ো মুৎসুদ্দিকেও সন্দ করা যায়।'

'কেন, মুৎসুদ্দি বুড়ো কী বললো?'

'তিনিও আমাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছেন। সে দিন আসার সময় আবিরবাও শুনেছে।'

'তাঁর স্বার্থ ?'

'স্বার্থ তো একটাই। আমি চলে গেলে এ বাড়িটায় তিনি মোটেল চালু করতে পারেন। অলরেডি কক্সবাজারে একটা মোটেল উনি চালাচ্ছেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলো ভাইয়া। তারপর বললো, 'মুৎসুদ্দিও খারাপ লোক হতে পারে, তাতে করে পাকড়াশী ভালো হচ্ছে না। তুমি যে একটু আগে নদীর কথা বললে, আমার মনে হচ্ছে পাকড়াশীও বোধ হয় এটা জানে। নইলে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর দু'পাশে দেড় শ' একর জমি কী কারণে কিনে রেখেছে? খামারে তো পাঁচ-ছয় একরের বেশি জমি নেই।'

'এই কথা?' হাসলেন নেলী খালা— 'পাকড়াশী মশাই আমাকে বলেছেন বাবারের চাষ করবেন। জমি নাকি তাঁর আরও লাগবে।'

এতোক্ষণ চুপচাপ নেলী খালা আর ভাইয়ার কথা শুনছিলাম। যেখানে আমার সন্দেহের জট পেকে আছে, সেটা ভাইয়া কিছুটা ধরতে পেরেছে। আজ সন্ধ্যার ঘটনার পর আমারও মনে হয়েছে পাকড়াশী নিপাট ভালোমানুষ নয়। কিন্তু ফতে আর গোবর কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, তার সঙ্গে পাকড়াশীর কী সম্পর্ক— সেটা জানতে না পারলে জট খোলা যাবে না। ফতে গোবর যে লোক ভালো নয়, এর প্রমাণ তো আমরা পেয়েই গেছি। ভাইয়া আর নেলী খালাকে ওদের সম্পর্কে যতোটুকু জানতাম বললাম, শুধু বাড়ির ভেতরের ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে।

ভাইয়া সব শুনে বললো, 'রণ-পা শুধু ভয় দেখাবার জন্য পরে না। এসব জায়গায় যেখানে যোগাযোগ সবচেয়ে খারাপ, সেখানে দূরের পথে যাবার জন্য কেউ কেউ এখনো রণ-পা পরে।'

নেলী খালা বললেন, 'ওদের ব্যবসার কাজে পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার ভেতর অন্যায় কিছু নেই। আমি লোক দুটোকে পছন্দ করি না ম্যানার শেখে নি বলে।'

গত রাতে ফতে আর গোবর আন্নাকালীর পাহাড়ে যে আলোর সংকেত পাঠিয়েছিলো, সে কথা নেলী খালাদের আর বললাম না। এ কথা কে না জানে, বড়োরা কখনো ছোটদের স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে দেয় না। ফতে গোবরের ব্যাপারে আমাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

ভাইয়া নেলী খালাকে বললো, 'মেজর জাহেদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমি একমত। এই এলাকায় যে স্মাগলিং হচ্ছে, তার সঙ্গে স্থানীয় কোনো লোক জড়িত নয়। তুমি বরং তাকে পাকড়াশী আর মুৎসুদ্দির ওপর বিশেষভাবে নজর রাখতে বোলো। আবিররা তো ফতে গোবরের ওপর নজর রেখেছেই।'

নেলী খালা বললেন, 'তুই তাহলে বলতে চাস খুনটাও বাইরের লোকে করেছে।'

'আমার তাই ধারণা।'

'অথচ জাহেদ খুনের ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের সন্দ করে বসে আছে। এখানকার স্থানীয়রা বাইরের লোকদের নাকি একেবারেই পছন্দ করে না।'

'সেটা ঠিক। আর পছন্দ করবেই-বা কেন? বাইরের লোকেরা এসে এখানকার জমি-টমি সব লীজ নিয়ে স্থানীয়দের ওপর অত্যাচার তো কম করছে না। তবে সমস্যাটা খুনোখুনির পর্যায়ে এখনো যায় নি। আমি অনেক দিন ধরে এদের ভেতর কাজ করছি তো। আসলে লোকগুলো খুবই নিরীহ আর শান্তিপ্রিয়।' একটু থেমে ভাইয়া কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'অবশ্য কতোদিন এরকম নিরীহ থাকবে বলা মুশকিল। বান্দরবন খাগড়াছড়ির দিকে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।'

নেলী খালা বললেন, 'তোরা সাবধানে থাকিস অপু।'

ভাইয়া মৃদু হাসলো— 'তোমার বন্ধুকে বলে দিও, স্মাগলার খুঁজতে গিয়ে আবার যেন আমাদের পেছনে না লাগে। আমি অবশ্য মেজর জাহেদের কথা বলছি না। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন করতেন, এটা আমরা জানি। কিন্তু নর্থে আর্মির লোকেরা আমাদের ওপর কম অত্যাচার করছে না।

ভাইয়ার শেষের কথাগুলো আমার কাছে ভীষণ রোমাঞ্চকর মনে হলো। বাবু বলছিলো, সাউথ আমেরিকায় বিপ্লবীদের সঙ্গে আর্মির সব সময় যুদ্ধ হচ্ছে। সেখানে বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। ভাইয়ারা কি সেরকম কিছু করেছে?

ভাইয়া আমার মুখের দিকে তাকালো। বুঝলো আমি কী জানতে চাইছি। মৃদু হেসে বললো, 'তোর সঙ্গে আলাদাভাবে আরেক দিন কথা বলবো আবির। কি বলতে চাইছিস বুঝতে পারছি। আজ আমার সময় নেই। নেলী খালা, তুমি বরং ওকে বোলো আমরা কী করছি।'

আমি বললাম, 'তুমি শুধু এটুকু বলো, পাকড়াশী কি তোমাদের কাজের কোনো ক্ষতি করছে?'

'নিশ্চয়ই করছে।' ভাইয়া শক্ত গলায় বললো, 'পাকড়াশীর মতো লোকেরা দেশের শত্রু। চোরাচালান যারা করে, তারা সবাই দেশের শত্রু। আর আমরা তো দেশের জন্যেই কাজ করি।'

নেলী খালা নিরীহ গলায় বললেন, 'পাকড়াশী চোরাচালান করে, এটা তোমার ধারণা। প্রমাণ তো কিছু পাওয়া যায় নি?'

আমি মনে মনে বললাম, 'প্রমাণ আমরাই খুঁজে বের করবো।'

ভাইয়া হেসে বললো, 'তাছাড়া পাকড়াশীদের ধরার জন্যে যেভাবে আর্মি ক্যাম্প বসানো হয়েছে, এতেও আমাদের কম ক্ষতি হচ্ছে না।'

এরপর ভাইয়া উঠে দাঁড়ালো— 'আজ আর কোনো কথা নয় আবির। তোরা তো আছিস কিছু দিন। পরে কথা বলবো। তোর বন্ধুদের সঙ্গে আমার ব্যাপারে আশা করি কিছু বলবি না। বাবুর কথা শুনেছি, খুব শার্প ছেলে। সামান্য একটু আঁচ পেলেই অনেক কিছু বুঝে ফেলবে।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ' তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার কথা বলবো না ভাইয়া। তবে তোমার চিঠির কথা ওকে বলেছি। ওই তো বললো তুমি বিপ্লবীদের গোপন দল করছো।'

'তবেই দ্যাখ, কী রকম ছেলে ও।' ভাইয়া হাসলো— 'আমি তো দলের কথা চিঠিতে কিছু লিখি নি।'

'তুমি আমাকে যে-সব বই পড়তে বলেছো, সেগুলো দেখেই ওর অমন ধারণা হয়েছে।'

ভাইয়া নেলী খালাকে বললো, 'কই, আমার জিনিসটা দাও।'

নেলী খালা আলমারি খুলে একটা খাম এনে দিলেন ভাইয়াকে। ভাইয়া সেটা না খুলে পকেটে গুঁজে বললো, 'এবার তাহলে যাই।'

নেলী খালা ম্লান হেসে বললেন, 'সাবধানে থাকিস অপু।'

ভাইয়া আমার চিবুক নেড়ে আদর করে আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি আর নেলী খালা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম, ভাইয়ার জীবনটা শুধু রোমাঞ্চের নয়, কষ্টেরও। নেলী খালা আস্তে আস্তে বললেন, 'অপুটা এ রকমই। মাঝে মাঝে হুট করে আসে, আবার হুট করে চলে যায়। আজ এসেই বললো, খেতে দাও। সারা দিনে দুটো পাহাড়ী কলা ছাড়া আর কিছু খাই নি।'

আমি বললাম, 'রোজ রাতে এসে খেয়ে গেলেই তো পারে। রাতে কে দেখবে!'

একটু হেসে নেলী খালা বললেন, 'ও কি এখানে থাকে নাকি! মাসে এক বার, বড় জোর দু'বার আসে, আবার কখনো দু'মাস পরেও আসে। তোরা আসবি খবর পাঠিয়েছিলাম। তাই এসেছিলো এবার।'

আমি বললাম, 'ভাইয়ার হাতে খামে করে কাকে চিঠি পাঠালে নেলী খালা?'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'চিঠি নয়, টাকা। আমি প্রতি মাসে ওদের দলের জন্যে কিছু চাঁদা দিই। ওদের টাকা-পয়সার ভীষণ টানাটানি। অপু তো একা নয়, ওর মতো বহু ছেলে আছে, যারা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে সর্বক্ষণ পার্টির কাজ করছে। ওদের জন্যে তো খরচ আছে।'

নেলী খালার জন্য গভীর ভালোবাসায় বুকটা ভরে গেলো। আমরা ভাইয়ার জন্য যতো না ভাবি, তার চেয়ে বেশি ভাবেন তিনি। বললাম, 'নেলী খালা, আমার স্কলারশিপের টাকা থেকে ভাইয়াদের জন্য যদি কিছু পাঠাই, তুমি ওদের দিতে পারবে?'

'কেন পারবো না!' মিষ্টি হেসে নেলী খালা বললেন, 'অপু আমাকে বলেছে, পারলে জাহেদের কাছ থেকেও টাকা নিতে।'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'বাবুকে যদি বলি, ও নিজেও খুশি হয়ে দেবে।'

'সেটা কি উচিত হবে?' চিন্তিত গলায় নেলী খালা বললেন, 'সব জানাজানি হয়ে যাবে না?'

'ও নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি এমনভাবে চাইবো যে বাবু বুঝতে পারলেও কিছু জানতে চাইবে না।

নেলী খালা কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুই তাড়াতাড়ি বড় হ। তোকে আরও কাজ করতে হবে। বাবা একা না হলে আমিও পুরোপুরি কাজে নেমে পড়তাম। এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। রাত কম হয় নি।'

নেলী খালার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হলো, এতক্ষণ বুঝি স্বপ্ন দেখছিলাম, যে স্বপ্নের কথা বাবু, ললি, টুনি— কাউকে বলা যাবে না, যা কিনা একান্তভাবেই আমার।

ভাইয়া বলেছে পাকড়াশীর জন্য তাদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে। তার মানে তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি পাকড়াশী আসলে এক জন স্মাগলার, তাহলে ভাইয়াদেরও উপকার হবে।

নুলিয়াছড়িতে বেড়াতে এসে এতোসব ঘটনার ভেতর জড়িয়ে যাবো, স্বপ্নেও ভাবি নি। নেলী খালা একটু আগে বললেন, বড় হলে নাকি কাজের ভার দেবেন। কাজ তো এরই মধ্যে আমরা শুরু করে দিয়েছি। পাকড়াশীকে ধরতে গিয়ে মেজর জাহেদের মতো অফিসারও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। অথচ পাকড়াশী সম্পর্কে আমরা যতোটুকু জানি, তার অর্ধেকও তিনি জানেন কিনা সন্দেহ। ঠিক করলাম, আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবো।

ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, 'বাবুর সঙ্গে কথা বলবো না', 'পৃথিবীটা কি অসার', — এইসব। সে-সব কথা মনে পড়াতে হাসি পেলো। মনে হলো ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। সাহস আর মনের জোরও বেড়ে গেছে অনেক।

পথ হারিয়ে গুপ্তধনের গুহায়

ফতেদের ঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় ওদের অনুসরণ করার প্ল্যানটার কথা মনে পড়লো। ছুটে গিয়ে বাবুকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। বাবু ঘুমঘুম চোখে উঠে বসলো। অবাক হয়ে বললো, 'কী হয়েছে!'

উত্তেজিত গলায় বললাম, 'আজ রাতে ফতে আর গোবর কোথায় যায় দেখবো।'

বাবু ঘুমজড়ানো গলায় বললো, 'তুমি কি ভেবেছো ওরা আজ রাতেও আলো দেখাবে?'

আমি বললাম, 'ভাববো কেন, কাল গোবর বিড়বিড় করে বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে নামছিলো, তখন আমি শুনেছিলাম।'

মনে হলো আমার কথা বাবুর বোধগম্য হয়েছে। ফুটো দিয়ে তাকানোর কথা বলতে ও আপত্তি করলো না।

মেঝের ফুটো দিয়ে আমরা আমাদের চোখ দুটো ওদের ওপর সারাক্ষণ বিঁধিয়ে রাখলাম। গোবর একসময় বললো, 'এ বাড়ির ছোঁড়াগুলো বাপু সুবিধের নয়। অষ্টপহর কুত্তো একটা নিয়ে যেন পেছনে লেগেই আছে।'

ফতে খেঁকিয়ে উঠে বললো, 'তুইও তো বাপু কম যাস না। এক শ' বার তোকে বলেছি, কুত্তো দেখে কক্ষনো ওরকম করিস নে। গিলে খাবে নাকি?'

নিজের রোগা লিকপিকে শরীরটাকে ভালো করে দেখে গোবর বললো, 'গিলে খেতে কতক্ষণ! তোর মতো বপু থাকলে না হয় কথা ছিলো।'

ফতে ধমক দিয়ে বললো, 'ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করিস নে গোবরা।'

এরপর ফতে কালো ব্যাগটা খুলে একটা চ্যাপটা মদের বোতল বের করলো। ছিপি খুলে ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে আবার ছিপি বন্ধ করে ওটা ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো। আড়চোখে করুণ মুখে গোবর ওটা এক বার দেখলো। তারপর বললো, 'যাবার তো সময় হয়ে এলো, যাবি নে?'

কব্জি উল্টে হাতঘড়িটা এক বার দেখলো ফতে। বললো, ' যেতে হয় তাহলে।' ব্যাগ থেকে লম্বা একটা টর্চ বের করে কয়েক বার জ্বালিয়ে দেখে বললো, 'আন্নাকালীর মন্দিরে ক' বার আলো জ্বলে দেখিস। গুনে গুনে ঠিক ততোবার জ্বালাবি।'

গোবর একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'হয়েছে, আর জ্ঞান দিতে এসো না বাপু! এই করে চুল পাকিয়ে ফেললাম। নাও, সিন্দুকটা ধরো। যা ভারি! কাল একা সরাতে গিয়ে আমার প্রাণ-পাখিটা আরেকটু হলে বেরিয়ে যেতো।'

আমি আর বাবু ফুটো দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, দেয়ালের দিক থেকে ওরা সিন্দুকটা সরিয়ে আনলো। ফতে বললো, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। এখন আর বন্ধ করে কাজ নেই। ঘরে তো আর কেউ আসছে না।

ফতে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো। সিন্দুকের আড়ালে সম্ভবত কোনো দরজা রয়েছে। দরজাটা দেখা গেলো না। ফতে চলে যাওয়ার পর কালো ব্যাগ খুলে গোবর আরেকটা লম্বা টর্চ বের করলো। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মদের বোতলটা বের করে কয়েক ঢোক গিলে ফেললো। পাশের টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা এনে খানিকটা পানি বোতলে ঢেলে ছিপি বন্ধ করে আগের মতো রেখে দিলো। তারপর আপন মনে 'যাই, ছাদের ঠাণ্ডা বাতাসে নেশাটা একটু ধরবে।'— এই বলে গোবর টর্চ হাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনে আমি আর বাবু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁকি মেরে দেখি, স্ক্যাটরার ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়ে পা টিপেটিপে গোবর দোতালার ছাদে উঠে যাচ্ছে। একটু পরে আমরা দু'জন একছুটে গোবরের ঘরে এসে ঢুকলাম।

ভেবেছিলাম সিন্দুকের আড়ালে বুঝি কোনো দরজা আছে। কাছে এসে দেখলাম দরজা নয়, একটা সুড়ঙ্গের মতো — নিচে নেমে গেছে। কয়েক ধাপ সিঁড়িও আছে। ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাবু আমার দিকে তাকালো একবার। আমি বললাম, 'একটা দেয়াশলাই হলে ভালো হতো।'

'দাঁড়াও, আমার ছোট টর্চটা নিয়ে আসি।' এই বলে বাবু ছুটে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে একটা খেলনার মতো ছোট্ট টর্চ নিয়ে হাজির হলো। আলো জ্বালিয়ে দেখালো। আলো কম হলেও পথ দেখা যাবে।

আমি টর্চটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লাম। বাবু আমার পেছন পেছন এলো। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে একটা ঘরের মতো। দু'দিকে দুটো পথ রয়েছে। একটা সমুদ্রের দিকে, আরেকটা পাহাড়ের দিকে। ফতের কথা মনে পড়লো। ও গোবরকে পাহাড়ের আলোর দিকে লক্ষ রাখতে বলেছে। তার মানে পাহাড়ে অন্য কেউ আলো দেখাবে। যে-পথ সমুদ্রের দিকে গেছে আমরা সে-পথ ধরে এগুলাম।

পথ মানে সুড়ঙ্গ। একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব, ভ্যাপসা গন্ধ। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিলো। ললি টুনির কথা মনে পড়লো। কাল যদি ওরা শোনে আমরা ওদের ফেলে এসব কাণ্ড করেছি, তাহলে মহা হৈচৈ বাধাবে। ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে। দরকার হলে টুনিকে না হয় একটা ভয়ের কথা বলে দেবো।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর মুখে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো। আমি টর্চ নিভিয়ে ফেললাম। একটা বাঁক পেরুতেই সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনলাম। অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো। একটু পরেই সুড়ঙ্গের মুখে সমুদ্র চোখে পড়লো। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখলাম সমুদ্রের তীর থেকে বেশ দূরে মস্ত বড়ো একটা কালো নৌকো।

বাইরে গিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি একেবারে সমুদ্রের তীরে এসে গেছি। অনেক ওপরে বিশাল বাড়িটা সারা শরীরে অন্ধকার মেখে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। গাটা ছমছম করে উঠলো। কিন্তু ফতে কোথায়? আশেপাশে তাকিয়ে ওকে দেখতে পেলাম না। বাবু হঠাৎ চাপা গলায় বললো, 'আবির দেখে যাও।'

আমি এগিয়ে গেলাম। বাবু আঙুল তুলে বললো, 'ওই দেখ! আরেকটা নৌকো।'

এদিকটায় খালের মতো একটা পানির স্রোত এসে সমুদ্রে মিশেছে। আমাদের সেই সোনাবালি নদীও হতে পারে। নদীতে নয়, তীরের বালির ওপর একটা ছোট্ট স্পীড-বোটের মতো, চাঁদের ফ্যাকাশে আলোতেও চকচক করছিলো। আমি বললাম, 'ফতে তাহলে এখনো আসে নি।'

আমার কথা শেষ না হতেই ফতের গলা শুনলাম। আরেক জন লোকের সঙ্গে বকবক করতে করতে এদিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খোলা জায়গা ছেড়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলাম।

ফতে বলছিলো, 'কোনো এক ব্যাটা এসেছে— রবারের চাষ করার নামে গোয়েন্দাগিরি করছে। কালও মাল বেশি সরাতে পারি নি। এদিকে রোজই তো শুধু জমছে। বড়ো কত্তা ক্ষেপে গেছে। বলেছে আজ যদি কিছু হয়, তাহলে আমাদের কারো মুখ দর্শন করবেন না। গোবরাকে তো বলেছেন, তুই যখন কুত্তো দেখে ভয় পাস, তখন তোকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবো। সেই থেকে গোবরা খচে আছে।'

ফতের সঙ্গী লোকটা বপুর দিক থেকে ফতেকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে ফতের মতো চর্বি জমা নয়, রীতিমতো মাসলঅলা পেটা শরীর। একমুখ কালো দাড়ি— অনেকটা পাইরেটদের মতো। যেন কিছু সন্দেহ করছে, ঠিক এভাবে চারপাশে এক বার তাকিয়ে দেখে বাজখাঁই গলায় বললো, 'আমার যেন মনে হলো ফতে, কিছু একটা যেন সরে গেলো। যেন মানুষের মতো। যেন—' শুনে আমাদের সারা শরীর হিম হয়ে গেলো।

ফতে ধমক দিয়ে বললো, 'তোর যেন যেন বলা থামা তো ছক্কা। মানুষ দেখার আর জায়গা পেলি নে। কোথায় কি শেয়াল না ভাম দেখেছিস। তুই অযথা ভাবছিস।'

ফতের ছক্কা নামধারী সঙ্গীটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো। এক বার আমাদের দিকেও মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। আমরা দু'জন একেবারে পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে আছি। দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। হাঁটতে হাঁটতে আবার বললো, 'অমন করছিস কেন ছক্কা! তোদের এক শ' বার বলি কাজের সময় বেশি মাল টানিসনে! কেমন, নেশা ধরেছে তো!'

ছক্কা বিড়বিড় করে কী যেন বললো, শুনতে পেলাম না। এরপর ফতে একটু চুপ থেকে বেশ জোরেই বললো, 'ছক্কা, তেলের টিন দুটো এনেছিস?'

ছক্কা বললো, 'কোথায় আনলাম! তুই কি আনতে বলেছিলি নাকি?'

ফতে তখন একটু রেগে গিয়ে বললো, 'যা, এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আয়। আমি এদিকটা দেখছি।'

ছক্কা তখন পেছন ফিরে আমাদের পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে গেলো। আর ফতে বড়ো কালো নৌকোর দিকে কয়েক বার টর্চের আলো ফেললো। নৌকোর ভেতর থেকে একটু পরে কাল রাতের মতো আলো জ্বলে উঠলো, আবার নিভে গেলো। আমরা অবাক হয়ে ফতে আর কালো নৌকোর সংকেত দেখছিলাম। ঠিক এমন সময় আমার একটা হাত কে যেন সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলো। চমকে উঠে এক ঝটকা মেরে পেছনে তাকিয়ে দেখি ছক্কা— সব কটা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। যেভাবে চেপে ধরেছিলো, ঠিক সেভাবেই ধরে রইলো। বাবুর অবস্থা ঠিক আমার মতো। বাবু প্রাণপণে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিছুই হলো না, বরং ছক্কার দাঁতগুলো আরো বেশি দেখা গেলো।

'ওসব চেষ্টা ছক্কার কাছে করে লাভ নেই চান্দু। বাড়াবাড়ি করলে হাত ভেঙে যেতে পারে। হয়তো আমিও ভুল করে একটু মোচড় দিতে পারি।' খুব শান্ত গলায় কথাগুলো বললো ছক্কা। তারপর গলা চড়িয়ে ফতেকে ডাকলো— 'আজও দুটো পাখি ধরেছি ফতে, তবে রাম পাখি নয়, চড়ুই পাখি।'

আসলে ছক্কার কাছে আমরা চড়ুই পাখির মতোই। অমন লোহার মতো শরীর আমি টেলিভিশনের কোনো ছবিতেও দেখি নি। ফতে একগাল হেসে বললো, 'ধরে রাখ। চড়ই পাখি আবার বেশি ছটফট করে।'

ছক্কা আমাদের দু'জনকে প্রায় শূন্যে দুলিয়ে ফতের কাছে নিয়ে গেলো। ফিকে অন্ধকারে ফতে প্রথমে আমাদের চেহারা দেখে নি— 'রাবার মাস্টার দেখি ক্ষুদে গোয়েন্দা লাগিয়েছে। বল ছোঁড়া এখানে কি করে এলি!' এই বলে এগিয়ে এসে বাবুর থুতনিটা তুলে ধরে ফতে যেন ধাক্কা খেলো— 'এ কি, তোমরা!' তারপর কর্কশ গলায় ধমক দিয়ে বললো, 'তোমরা এখানে এলে কীভাবে?'

বাবু রেগে গিয়ে বললো, 'আমাদের খবরদারী করতে হবে না। ভালো চাও তো এক্ষুনি ছেড়ে দাও, নইলে সব্বাইকে পুলিশে দেবো।'

খিকখিক করে ফতে বিচ্ছিরি রকম হেসে বললো, 'ও বাবা, তেজ কতো! রোসো বাছা, গোয়েন্দাগিরির মজা দেখাচ্ছি। কান দুটো যদি মাথার সঙ্গে লাগানো দেখতে চাও, এই বেলায় ভালোয় ভালোয় বলে ফেল বাপু, তোমরা কোন পথে এখানে এসেছো?'

বাবু চুপ করে রইলো। ফতে ওর কান ধরার জন্যে হাত বাড়ালো। আমি বললাম, 'ওর কান ধরতে হবে না। আমি বলছি। তুমি যে-পথে এসেছো, আমরাও সে-পথে এসেছি।'

'বটে বটে! এই তো দিব্যি কথা বেরুচ্ছে। তা বাপু তোমার বন্ধুটি গোঁয়ার কম নয়। তুমি বেশ বুদ্ধিমান। তাহলে বাছা এবার তুমিই বলো দিকি নি, আমার ঘরে কেন ঢুকেছিলে? আর আমি যে এখানে, সেটাই-বা জানলে কী করে? তাছাড়া অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তারপর ঢোক গিলে বললাম, 'বারে, তোমাকে ডাকার জন্যে একটা লোক এলো যে! দরজার ঘণ্টা শুনে আমরা নিচে এলাম। এক জন লোক বললো, এখানে মিস্টার ফতেউল্লা বলে একজন গেস্ট থাকেন না? ওঁকে ডেকে দিন। আমরা তখন তোমার ঘরে এসে নক করলাম। দেখি সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা ধাক্কা দিতে খুলে গেলো। দেখি তুমি ঘরে নেই। তারপর শ্রী গোবর্ধনের ঘরে গেলাম। সেখানেও কেউ নেই। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম, যদি বিপদ-টিপদ কিছু হয়! তারপর আবার তোমার ঘরে এসে ভালো করে খুঁজলাম! তখনই এই পথটা চোখে পড়লো। ভাবলাম হয়তো এ-পথেই কোথাও গেছো। তাই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি। এসে যখন তোমাকে ডাকতে যাবো তখনই তো ছক্কা এসে ধরলো।'

কথাগুলো এতো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বললাম যে, বলার পর আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। ফতেও দেখলাম একটু চিন্তায় পড়ে গেছে। বললো, 'যে লোকটা ডাকতে এসেছিলো, সে দেখতে কেমন?'

আমার হঠাৎ বুড়ো মুৎসুদ্দির কথা মনে পড়লো। অবিকল ওঁর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললাম, 'কানেও কম শোনেন।' শুনে ফতে আরো চিন্তিত হয়ে পড়লো। বিড়বিড় করে বললো, 'মনে হচ্ছে বুড়ো মুৎসুদ্দি এসেছিলো। তবে কি আমাদের কথায় বুড়ো রাজি হয়েছে! আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলো ফতে। তারপর বললো, ' দেখ বাছারা, আমি মানতে পারি তোমরা কোনো পাপ মন নিয়ে আমাদের পেছনে লাগো নি। কিন্তু মনে পাপ জাগতে কতোক্ষণ। বিশেষ করে তোমরা আমাদের অনেক কথাই শুনে ফেলেছো। আমাদের ভালোর জন্যেই তোমাদের আটকে রাখা উচিত। বড়ো কত্তা যদি ঝামেলা বাড়াতে না চান, তাহলে হয়তো মেরেও ফেলতে পারেন। তবে সে দায় বাপু আমি নিচ্ছি না। তোমাদের নুন খেয়েছি আমি। আমি শুধু তোমাদের দু'জনকে বড়ো কত্তার হাতে তুলে দেবো।'

আমি মন দিয়ে ফতের কথাগুলো শুনলাম। ওষুধে কিছুটা ধরেছে বটে, তবে আরো ধরা উচিত ছিলো। আমি একটু টিপ্পনি কেটে বললাম, 'তা নুন যখন খেয়েছো আর সেটা যখন মনেও রেখেছো, তখন সবচেয়ে পুণ্যের কাজ হবে আমাদের বাড়িতে যেতে দেয়া।'

ফতে একটু বিষণ্ন গলায় বললো, 'ওটি মাপ করতে হবে বাছা। অনেক পাপ করেছি জীবনে। এটুকু পুণ্যে তার কিছুই কাটবে না। বরং এই পুণ্যের লোভ করলে হাতে হাতকড়া পড়তে আর বেশি দেরি হবে না। ছক্কা, তুই গোবরাকে আলো দেখিয়ে আজকের মতো বারণ করে দে। ও দু'টিকে আমার হাতে দে। কী আর করা। আজও মাল গেলো না। বড়ো কত্তা এমনিতে রেগে বাঁখারি হয়ে আছেন। এ দুটোকে দেখিয়ে যদি শান্ত করা যায়, দে দেখি।'

ফতের হাতে আমাদের তুলে দেয়ার জন্যে ছক্কা যখন সাঁড়াশির বাঁধনটা হালকা করলো, ঠিক তখনই প্রাণপণ শক্তিতে এক ঝটকা মেরে ছক্কার হাত থেকে বেরিয়ে এলাম। বাবুও ঠিক তাই করলো। হতভম্ব ছক্কার চোখের সামনে দিয়ে আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলাম।

বেশি দূর আর নিশ্চিন্তে যাওয়া গেলো না। একটু পরেই পেছনে ভারি ভারি পায়ের শব্দ শুনলাম। বুঝলাম ছক্কা আর ফতে দু'জনই ছুটে আসছে। ওদের কথাও শুনলাম। ছক্কা বলছে, 'এক্ষুনি ধরে ফেলবো ওস্তাদ। এটুকু পুঁচকে ছোঁড়া আমার সঙ্গে মামদোবাজি করবে? এ জন্মে আর হবার নয়।'

ফতে ধমক দিয়ে বললো, 'ম্যালা বকিস নে ছক্কা। ও দুটোকে না পেলে তোকে আজ শূলে চড়ানো হবে।'

পেছন থেকে ফতে টর্চের আলো ফেলছিলো। তাতেই আমরা পথ দেখে ছুটছিলাম। মাটি এবড়োথেবড়ো বলে বেশি জোরে দৌড়ানোও যায় না। বাবু একবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলো। ওকে টেনে তুলে আবার প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর মনে হলো ফতে আর ছক্কাকে একটু পেছনেই ফেলে এসেছি। এবার এতো জোরে না ছুটলেও চলবে। তাছাড়া ওদের টর্চের আলোও দেখা যাচ্ছিলো না। বাবু ওর ছোট টর্চটা বের করে বোতাম টিপলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

আমরা সুড়ঙ্গের ভেতরই দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এদিকে সুড়ঙ্গটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। আগের চেয়ে অনেক চওড়া। বাবু হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'ওপরে ওঠার পথ অনেক আগেই পেছন ফেলে এসেছি। দৌড়ে আসছিলাম বলে সময়টা ঠিক বুঝতে পারি নি। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

বাবু বললো, 'এখন কী করবে? ফিরে যাবে?' আমি বললাম, 'পেছন গিয়ে লাভ নেই। ফতে আর ছক্কা নিশ্চয়ই এতো সহজে ছেড়ে দেবে না। চলো সামনে এগুই। মনে হচ্ছে সামনে একটা বের হবার পথ পাবো।'

বাবু কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললো। আমি কাছে এসে ওর একটা হাত ধরলাম, 'তুমি ভয় পেয়েছো বাবু ? ভয় পেলে আর কোনো দিন এখান থেকে বেরুতে পারবো না।'

বাবু আমার হাতটা চেপে ধরে বললো, 'না, ভয় পাই নি।'

একটু পরেই আমরা একটা বড়ো গুহার মতো ঘরে এসে পড়লাম। বাবু চারপাশে টর্চের আলো ফেললো। আমার একটা হাত বাবুর হাতে ধরা ছিলো। সে আমার হাতটা আরো চেপে ধরলো। আমি চমকে উঠে চারপাশে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখটা হাঁ হয়ে গেলো।

গুহার মতো যে-ঘরটাতে আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ওটাকে কী বলবো ! মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সাজানো শুধু রাশি রাশি টাকা আর সোনার তাল। সব এক শ' টাকার নোট আর ছোট ইটের মতো সোনার টুকরো। সিঁড়ির মতো চারপাশে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। বাবুর ছোট্ট টর্চের ম্লান আলোতেও সেই সমস্ত সোনা রীতিমতো ঝলসে উঠলো। আমি কেন, আমাদের বংশের কেউ কোনো দিন একসঙ্গে এতো টাকা আর সোনা দেখে নি। আমার মনে হলো, কেউ যদি চোখ বেঁধে আমাকে এখানে নামিয়ে দিতো, তাহলে আমি বলতাম, 'এটা নিশ্চয় স্টেট ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুম !'

বাবু অনেকক্ষণ পর ফিসফিস করে বললো, 'এটাই তাহলে সোনার খনি !'

আমি শুধু বললাম, 'সোনার খনি নয়, গুপ্তধন। টাকাগুলো মনে হচ্ছে আসল নয়।'

মুহূর্তের মধ্যে আমরা ভুলে গেলাম ছক্কা আর ফতে এখনো আমাদের তাড়া করে ফিরছে; খুব শিগগিরই ওরা এখানে এসে যাবে। বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় আমরা রীতিমতো কাঁপছিলাম।

কতোক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই। ছক্কা আর ফতের গলা শুনে আমাদের চমক ভাঙলো। ফতেকে বলতে শুনলাম, 'কোথায় যে গেলো ছোঁড়া দুটো !' আর ছক্কা বললো, 'মালখানায় একবার দেখলে হয় না ওস্তাদ ?'

আমরা আবার হুঁশ ফিরে পেলাম। সামনে শুধু একটাই যাবার পথ। পেছনের পথ ধরে ছক্কা আর ফতে আসছে। ছক্কার সেই সাঁড়াশির মতো হাত আর ফতের ভয়ঙ্কর কথাগুলো মনে পড়লো। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা সামনের পথেই ছুটলাম, পেছনে শুধু ছক্কার গলা শুনলাম, 'ওস্তাদ, এদিকে পায়ের শব্দ শুনছি।'

এক গুহা থেকে আরেক গুহায়— এভাবে কয়েকটা গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পর অবশেষে আমাদের থামতে হলো। আগে খেয়াল না করেই সেই গুহাটার ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম। এ ছাড়া অবশ্য অন্য কোনো পথও ছিলো না। ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম এবার আমরা সত্যিই ধরা পড়ে গেছি।

গুহার ভেতর আলো জ্বলছিলো। দশ-বারোটা যাচ্ছেতাই চেহারার লোক সেখানে গোল হয়ে বসে আছে। মাঝখানে এক বিশাল টাকার পাহাড়। সব দশ টাকা আর একশ টাকার নোট। লোকগুলো টাকা গুনে ব্যাগে ভরছিলো।

যে-লোকটা আমাদের প্রথম দেখলো, তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো হলো। হাত থেকে টাকার ব্যাগটা খসে পড়লো। এক জন— 'তোর কি হলোরে পঁচা ! অমন করছিস কেন?' —এই বলে পঁচার দৃষ্টি অনুসরণ করে যেইমাত্র আমাদের দিকে তাকালো, তক্ষুনি তার দশাও ঠিক পঁচার মতো হলো। এরপর সবাই আমাদের দিকে ফিরে তাকালো। আর চোখগুলোকে আলু বানালো।

আমরা দু'জন কিছুই বলতে পারলাম না। চুপচাপ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে ছক্কা এসে ঢুকলো। চিৎকার করে আমাদের দিকে ছুটে এলো— 'এইবার চান্দু, কোথায় পালাবে ?' এতোক্ষণ ঘুঘু দেখিয়েছি, এবার ফাঁদ দেখাবো।' এরপর ছক্কার সাঁড়াশির মতো দুটো হাত আমাদের দু'জনের কবজি চেপে ধরলো। প্রতিবাদ করার এতটুকু শক্তি ছিলো না। আমরা অবশেষে ছক্কার হাতে আত্মসমর্পণ করলাম।

তারপর আমাদের শুধু দেখার পালা। ছক্কা বললো, 'এক জন গিয়ে এক্ষুনি শক্ত দেখে দড়ি নিয়ে আয়। এ দুটোকে কোনো বিশ্বাস নেই। জাত কেউটের ছা !'

ঘরের লোকদের ভেতর পঁচা আমাদের প্রথম দেখেছিলো। ওর উৎসাহটাই দেখলাম সবচেয়ে বেশি। 'আমি আনছি ওস্তাদ' —এই বলে পঁচা চোখের পলকে দু'খানা নাইলনের কর্ড নিয়ে এলো। সেগুলো দেখে ছক্কা সব কটা দাঁত বের করে বললো, 'এবার হাত দু'খানা দেখি বাছাধন !'

বাবু একবার বুঝি দরজার দিকে তাকিয়েছিলো। ছক্কা বললো, 'ইতিউতি তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। এবার কোনো গণ্ডগোল বাঁধিয়েছো তো বড়ো কত্তা আসা পর্যন্ত বসে থাকবো না। আমি নিজেই পিটিয়ে দুরমুশ করে দেবো।'

পঁচা এসে আমাদের প্রত্যেকের হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলো। এর পর ছক্কা আমাদের ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিলো। বাবু হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ওর কপাল কেটে দরদর করে রক্ত নেমে এলো। আমি পড়তে পড়তে সামলে নিলাম।'

এতোক্ষণে ফতে কথা বললো, 'ওদের পাশের ঘরে নিয়ে আয় ছক্কা। আর পঁচা গিয়ে বড়ো কত্তাকে খবর দে!'

ছক্কা আমাদের ঘাড় ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে পাশের গুহায় নিয়ে গেলো। ফতে বললো, 'ভেবেছিলাম বাছা তোমাদের জন্যে বড়ো কত্তার কাছে একটু ওকালতি করবো। তা তোমাদেরই বাপু কপাল মন্দ। আমার এই বাতের শরীর নিয়ে বাপের জন্মে কখনো এমনি ভাবে ছুটি নি। নিজের কপাল নিজেই খেলে। আমি কী করবো!'

আমি বললাম, 'নিজের চরকায় তেল দাও।'

বাবু বললো, 'এবার ম্যারাথন রেসের জন্যে তৈরী হওগে। জাহেদ মামা এক্ষুনি এলেন বলে।'

ছক্কা আমাদের মাথায় দুটো গাট্টা মেরে বললো, 'বলি নি ওস্তাদ, জাত কেউটের ছা ! কিরকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছে দেখ !'

ছক্কার গাট্টা খেয়ে আমি আর বাবু চোখে সর্ষে ফুল, নীল তারা—সব একসঙ্গে দেখতে লাগলাম। ফতে বললো, 'থাক এখানে বসে। যাই ওখানে একটা খবর দিয়ে আসি। তোদের বাড়ির কেউ টের পেলো কিনা কে জানে। আর পেলেই বা কি !'

ফতে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছক্কা পকেট থেকে চ্যাপটা একটা মদের বোতল বের করে মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসলো। ঢকঢক করে কয়েক ঢোক গিলে বললো, অনেক দিন নিজের হাতে কাউকে সাবাড় করি নি। হাত দুটো ভারি নিশপিশ করছে। বড়ো কত্তাকে বলে এবারের কাজটা আমি নিজেই করবো ।'

পাশের ঘর থেকে একজন ছক্কাকে ডেকে বললো, 'ওস্তাদ, একা পুরো বোতল মেরে দেবে নাকি ! আমরা তোমার পেসাদ পাবো বলে কখন থেকে বসে আছি।'

একগাল হেসে ছক্কা উঠে পাশের ঘরে গেলো। বাবু আমার দিকে তাকালো। ওর মুখে রক্তের দাগ। মুছে দিতে যাবো— খেয়াল হলো, আমারও হাত দুটো পেছনে বাঁধা। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি বসে থাকো। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

বুদ্ধিটা এসেছিলো খোলা চিমনি ঢাকা বাতিটা দেখে। কোনো একটা ছবিতে দেখেছিলাম, এ রকম এক অবস্থায় নায়কটা বাতির আগুনে হাতের বাঁধন পুড়িয়ে ফেলেছিলো।

পাশের গুহায় ওদের জমজমাট আসর বসেছে। আমি চুপি চুপি বাতিটার কাছে গেলাম। একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর রাখা ছিলো বাতিটা। বুকটা তখন টিবটিব করছে। আন্দাজের ওপর বাতির আগুনে হাতটা রাখলাম। বাবু একটু হাতটা ডানপাশে সরাতে বললো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আলোর অনেক দূরে আমি হাত রেখেছি। একটু লজ্জাও পেলাম। হাতটা সরিয়ে ফেললাম। আর ততোক্ষণে হাতের ধাক্কা লেগে চিমনিটা কাত হয়ে পড়ে ঝনঝন শব্দ করে ভেঙে গেলো।

'কী হচ্ছে ওখানে' — বলে ছক্কা ছুটে এলো। ভাঙা চিমনি আর আলোর কাছে আমাকে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে ওর একটুও অসুবিধে হলো না। মোলায়েম গলায় বললো, 'ছিঃ, অমন কাজ কেউ করে! হাতে ফোস্কা পড়বে যে।' তারপর এগিয়ে এসে মাথায় আরেকটা গাট্টা মেরে আমাকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলো— 'ফের মামদোবাজি করা হচ্ছে।' এই বলে ছক্কা আলোটা নিয়ে চলে গেলো।

মাথায় হাত না দিয়েও টের পেলাম ওখানে দুটো সুপারি গজিয়েছে। ছক্কার গাট্টা যারা খায় নি, তাদের কখনো বলে বোঝানো যাবে না, কী ভয়ঙ্কর গাট্টা মারতে পারে এই বদমাশটা ! ললি টুনির কথা মনে পড়লো। ওরা এখনো কি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে ? ওদের বলে আসা উচিত ছিলো। কোনো রকমে যদি ওরা জানতে পারে, তাহলে এতোক্ষণে সবাই নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। জাহেদ মামার লোকদের যারা খুন করেছে, তাদের খুঁজতে খুঁজতে তিনি যদি এমন সময় লোকজন নিয়ে এখানে এসে পড়তেন, তাহলে বেশ হতো। দেয়ালে মাথা রেখে বসে বসে এমনি সব আজগুবি কথা ভাবছিলাম। এমন সময় পঁচা এলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো। তারপর পাশের গুহায় গিয়ে বললো, 'বড়ো কত্তা এক্ষুনি আসবেন। তোমরা সব গুছিয়ে নিয়ে বাইরে পাহারার ব্যবস্থা করো।'

এক জন পঁচাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মাল কি আজও যাবে না ওস্তাদ ! ট্যাক যে গড়ের মাঠ।'

লোকটার কথার ধরন দেখে মনে হলো কলকাত্তাইয়া। পঁচা বললো, 'ও নিয়ে তোরা ভাবিস না। যে দু'খানা হীরের টুকরো পেয়েছি— বড় কত্তা সব পুষিয়ে দেবেন।'

'আমাদের ওপর খেয়াল রেখো ওস্তাদ' —এই বলে ভেতরের লোকগুলো ঢুলতে ঢুলতে একে একে বেরিয়ে গেলো। গুহার ভেতর শুধু রইলো ছক্কা আর পঁচা। বসে বসে মদ খাচ্ছিলো ওরা। দুর্গন্ধে ভরে আছে গুহার ভেতরটা।

শুধু অবাক হবার পালা

আমাদের বোধ হয় একটু ঝিমুনির ভাব এসেছিলো। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক ভেতরে ঢুকলো। চারপাশে তাকিয়ে ডাকলো, 'পঁচা ওস্তাদ, তুমি কোথায় ?'

পঁচা ভেতরে থেকে জবাব দিলো— 'এখানে। ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ?'

লোকটা ভেতরে ঢুকলো। পঁচা ওকে ধমক দিয়ে বললো, 'তোদের এক শ' বার বারণ করেছি না আমাকে পঁচা বলে ডাকবি না। বাপ-মা আদর করে বলতো বলে তোরাও আমার মা-বাপ হলি নাকি! আমাকে পঞ্চানন ওস্তাদ বলবি, নইলে মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে ফুটবল খেলবো।'

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'তা না হয় খেললে। এখন লেকচার থামিয়ে ছোঁড়া দুটোকে নিয়ে খাস কামরায় এসো। বড়ো কত্তা ডাকছেন।'

বড়ো কত্তার কথা শুনে পঁচা মিনমিনে গলায় বললো, 'বড়ো কত্তা ডাকছেন, আগে বলবি তো।'

পঁচা আমাদের ঘাড় ধরে টেনে তুললো। ছক্কা বললো, 'খবদ্দার ছোঁড়া, তোদের মেরেছি বা ধমক দিয়েছি — এসব কথা যদি বড়ো কত্তাকে বলিস, তাহলে মরার সময় টের পাবি আমি কী রকম রসিয়ে রসিয়ে মারতে পারি।'

ছক্কা আর পঁচা আমাদের কয়েকটা গুহার ভেতর দিয়ে ওদের বড়ো কত্তার খাস কামরায় নিয়ে এলো। কিন্তু বড়ো কত্তা কোথায় ? এযে দিখি আন্নাকালীর পাহাড়ের সেই নিকুঞ্জ পাকড়াশী ! পাশে ফতে বসে আছে। আমাদের দেখে পাকড়াশী লোম ওঠা, উকুন-অলা, বেতো কুকুরের মতো খেঁকিয়ে উঠলো — 'তোদের আস্পদ্দা তো বাছা কম নয়, আমার পেছনে লাগতে আসিস ? তোদের জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেললেও আমার রাগ যায় না।'

বাবু ভালোমানুষের মতো বললো, 'আপনার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আপনি এসবের মধ্যে আছেন আমরা জানবো কী করে ?'

পাকড়াশী আগের মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললো, 'থাক থাক, আর আদিখ্যেতা দেখাতে আসিস নে। সবাই পঞ্চমুখ হোক আর পঞ্চাশ মুখ হোক, তোদের আমি ছাড়ছি নে। তোরা

আমাকে পথে বসাবার জো করেছিলি। তোদের সঙ্গে ছুঁড়ি দুটো যে ঘুরতো, সেগুলো কোথায় ?'

বাবু কী যেন বলতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ ঘেউঘেউ শব্দ শুনে ঘরসুদ্ধো সবাই চমকে উঠলো। বাবু চাপা গলায় বললো, 'স্ক্যাটরা আসছে।'

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'স্ক্যাটরা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ করে স্ক্যাটরা ভেতরে ঢুকলো। ছুটে এসে আমার গাল চেটে দিলো। হাত বাঁধা বলে আমি আদর করতে পারলাম না। স্ক্যাটরা বুঝতে পেরে পেছনে গিয়ে দাঁত দিয়ে কর্ডটা ছেঁড়ার চেষ্টা করলো। আমারটা না পেরে বাবুর কাছে গেলো। তার পর ছক্কা আর পঁচাকে দেখে মহা চিৎকার জুড়ে দিলো।

পাকড়াশী চেঁচিয়ে বললো, 'এই কুত্তোটা এখানে এলো কী করে !' ওর কথা শেষ না হতেই ললি টুনি ছুটতে ছুটতে এসে ভেতর ঢুকলো। আমাদের এই অবস্থা দেখে ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। স্ক্যাটরা তখন ওদের কাছে ছুটে গেলো।

আমি বললাম, 'তোমরা কী করে এখানে ? গোবর্ধন কোথায় ?'

টুনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'গোবর্ধনকে ধরে শেকল আটকে রেখে এসেছি। বাথিনাকে পাঠিয়েছি জাহেদ মামার কাছে।'

পাকড়াশী খিকখিক করে হেসে বললো, 'ভালো কাজ করেছিস। কই রে বাথিন, 'টিকটিকিটাকে কী বলেছিস এসে এদের বল।'

ওপাশের পথ দিয়ে বাথিন এসে ভেতরে ঢুকলো। তারপর পাকড়াশী আদর করে ডাকলো, 'গোবর, তুই আবার কোথা গেলি !'

লাজুক মুখে গোবর এসে পাকড়াশীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ললি আর টুনির চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেলো। পাকড়াশী বললো, 'অমন করে তাকাস নে বাছা, চোখের মণিটা ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সব কটাই তাহলে ধরা পড়লো। এবার টিকটিকিটার ব্যবস্থা করে এক্ষুনি আমরা জাহাজ নিয়ে কেটে পড়বো। গোবর, ছুঁড়ি দুটোকেও এগুলোর মতো বেঁধে ফেল।'

গোবর একটা দড়ি হাতে যেইমাত্র ললি টুনির দিকে এগিয়েছে, তখনই স্ক্যাটরা ঘেউ করের ওর দিকে তেড়ে গেলো। গোবর 'ওরে বাপ' বলে এক লাফে পিছিয়ে এসে একেবারে পাকড়াশীর কোলে বসে পড়লো।

পাকড়াশী ওকে কান ধরে টেনে তুললো। রেগে চেঁচিয়ে বললো, 'এখনো তোর কুত্তার ভয় যায় নি দেখছি। বলেছি না ফের ভয় পেলে তোকে ডাল কুত্তো দিয়ে খাওয়াবো। দাঁড়া, ডাল কুত্তো নয়, আজ তোকে এই কেলে কুত্তো দিয়েই খাওয়াবো।'

স্ক্যাটরা সমানে ঘেউঘেউ করতে লাগলো। পাকড়াশী বিরক্ত হয়ে বললো, 'কুত্তোটাও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। ছক্কা, এটাকেও বেঁধে ফেল।'

এবার স্ক্যাটরা চিৎকার করে ছক্কার দিকে তেড়ে গেলো। ছক্কা হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলো। সেই হাতে স্ক্যাটরা গাঁক করে কামড় দিয়ে এক খাবলা মাংস তুলে নিলো। তারপর স্ক্যাটরা প্রচণ্ড গর্জন করে পাকড়াশীর দিকে ছুটে গেলো। স্ক্যাটরার দাঁতে রক্ত, চোয়াল বেয়ে রক্ত পড়ছে। ওকে তখন রীতিমতো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিলো।

হাউমাউ করে চেঁচিয়ে পাকড়াশী বললো, 'এতোগুলো তোরা ঘরের মধ্যে—কুত্তোটাকে কেউ আটকাতে পারিস না !'

এমন সময় ফতে কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে স্ক্যাটরার দিকে ছুঁড়ে মারলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ডাকলাম, 'স্ক্যাটরা।'

স্ক্যাটরা যদি সেই মুহূর্তে ফিরে না তাকাতো, তাহলে ছুরিটা ওর চোখে গিয়ে বিঁধতো। তার বদলে মাথার চামড়ায় আঁচড় কেটে ছুরিটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো। পাকড়াশীকে ফেলে

স্ক্যাটরা ফতের টুঁটি কামড়ে ধরলো। ফতে তার বিশাল শরীর নিয়ে মেঝেতে দড়াম করে আছড়ে পড়লো।

এই ফাঁকে দুটো লোক এসে চোখের পলকে ললি টুনির হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। দু'জন গিয়ে জাপটে ধরলো স্ক্যাটরাকে। মনে হলো বাঁচবার আর বুঝি কোনো আশা নেই। বাবুর দিকে তাকালাম। অসহায়ভাবে ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

পাকড়াশী দেওয়ালের সাথে লাগানো আলমারিটার কাছে ছুটে গেলো। এক ঝটকায় আলমারি খুলে ভেতর থেকে কালো ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে আনলো।

'আগে কুত্তোটাকে শেষ করবো' —এই বলে স্ক্যাটরার দিকে তাক করে ট্রিগার টিপতে যাবে, ঠিক তখনই দরজার কাছে যেন বোমা পড়লো—।

'হ্যান্ডস আপ এভরি বডি। সবাই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

পাকড়াশীর হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ে গেলো। টুনি চিৎকার করে শুধু বললো, 'জাহেদ মামা !'

জাহেদ মামার সঙ্গে আরো কয়েক জন আর্মি অফিসার, পুরো ইউনিফর্ম পরা, প্রত্যেকের হাতে পিস্তল আর পেছনে দুটো স্টেনগানের নল চকচক করছে। দু'জন স্টেনগানধারী সৈন্য ভেতরে এসে পজিশন নিলো। স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে জাহেদ মামার গাল-টাল চেটে একাকার করে দিলো। এক জন অফিসার এগিয়ে এসে পাকড়াশী, ফতে, গোবর, ছক্কা, পঁচা আর বাথিনকে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জাহেদ মামা আমাদের হাতের বাঁধন কেটে দিতে দিতে বললেন, 'তোমাদের এরা বেশি মারধোর করে নি তো ?'

আমি বললাম, 'বেশি কিছু করে নি। ছক্কা শুধু মাথায় গাট্টা মেরে কটা সুপুরি বানিয়ে দিয়েছে।'

হাতকড়া পরা ছক্কা কটমট করে আমার দিকে তাকালো। টুনি ওকে ভেংচি কাটলো। ললি শুধু মুখ টিপে হাসলো।

বাবু বললো, 'আরও তো ছিলো জাহেদ মামা। ওরা কোথায় ?'

জাহেদ মামা একটা রুমাল বের করে বাবুর কপালের রক্তটা মুছে দিতে দিতে বললেন, 'সব কটা ধরা পড়েছে। তোমরা সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলেছো !'

এমন সময় আমরা নেলী খালার গলা শুনলাম।— 'আমার ছেলেমেয়েরা কোথায় ?' বলতে বলতে নেলী খালা এসে ভেতরে ঢুকলেন। স্ক্যাটরা যথারীতি ছুটে গিয়ে তাঁর গাল চেটে দিলো।

নেলী খালা এক বার আমাকে, এক বার বাবুকে আর এক বার ললি টুনিকে চুমো খেতে খেতে বললেন, 'আমাকে না জানিয়ে এতো সব করা হয়েছে! আমি শুধু ভেবে ভেবে মরি। আমি বুঝি তোদের কেউ নই !' বলতে বলতে নেলী খালা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

জাহেদ মামা এগিয়ে নেলী খালার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নেলী, ওদের নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি।'

স্ক্যাটরাকে জড়িয়ে ধরে নেলী খালা বললেন, 'ইশ, তোর মাথা কেটে গেছে দেখছি ! কী করে এমন হলো?'

টুনি বললো, 'ওই কালোদেড়ে ছক্কা শয়তানটা স্ক্যাটরাকে ছুরি মেরেছিলো।'

নেলী খালা এবার পাকড়াশীকে ধরলেন— 'আপনার পেটে পেটে যে এতো বিদ্যে, তা তো জানতাম না নিকুঞ্জ বাবু। আমার অতিথি দু'জনও দেখি বহাল তবিয়তে আছে।'

গোবর নালিশ জানাবার মতো করে করুণ গলায় বললো, 'আপনার কুত্তোটা ফতের গলা কামড়ে দিয়েছে দিদি।'

নেলী খালা এক বার ফতের দিকে তাকালেন। ওর গলা রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। 'বেশ করেছে।' —বলে নেলী খালা আমাদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমরা যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম, নেলী খালা তার উল্টো দিকের পথে গেলেন। টুনি বললো, 'এপথে তোমরা এলে কী করে ?'

নেলী খালা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, আমরা সবাই এ পথে এসেছি। ওদের একটা লোককে দু'ঘা বসাতেই সব দেখিয়ে দিলো। বাইরে থেকে অবশ্য আমরা স্ক্যাটরার গলার শব্দ শুনেছিলাম।'

স্ক্যাটরা ওর নাম শুনে আরেক দফা নেলী খালাকে চেটে দিলো।

বাবু বললো, 'আমরা ফতের ঘরের ভেতর দিয়ে এখানে এসেছি। আপনি ওর ঘরের নিচে সুড়ঙ্গ দেখেন নি নেলী খালা ?'

নেলী খালা বললেন, 'তাড়াহুড়োয় চোরাপথ একটা দেখেছিলাম বটে। ভেবেছি আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলারে যাবার পথ বুঝি ওটা। আমি তো তোমাদের না দেখে জীপ নিয়ে সোজা জাহাজের ওখানে গেলাম। ততক্ষণে অবশ্য জাহেদরা বেশ কটাকে ধরে ফেলেছে।'

আমরা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভেতরটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ওদিকের মতো এবড়োথেবড়ো নয়। বাবুর মিটমিটে টর্চের আলোতে চারপাশে দেখছিলাম। বাবু বললো, 'নেলী খালা সোনার খনি দেখেন নি?'

নেলী খালা চমকে উঠে বললেন, 'কোথায় সোনার খনি !'

টুনি অবাক হয়ে বললো, 'তুমি কোথায় দেখলে ?'

আমি বললাম, 'সোনার খনি নয়। চোরাই সোনা। ওরা পাচার করার জন্যে তাল তাল সোনা একটা গুহার ভেতর স্তূপ করে রেখেছে। জাহেদ মামারা নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন।'

বাবু বললো, 'টাকার কথাও বল আবির।'

ললি বললো, 'কিসের টাকা ?'

আমি বললাম, 'টাকার পাহাড়। সব দশ টাকা আর এক শ' টাকার নোট। পাকড়াশীর লোকেরা গুনে গুনে বস্তায় ভরছিলো।'

ললি বললো, 'তোমরা সত্যিই তাহলে গুপ্তধন আবিষ্কার করেছো !'

আমি বললাম, 'বলতে পারো। তবে এ গুপ্তধন হার্মাদদের নয়, ওদের মতো আরেক পাজি নিকুঞ্জ পাকড়াশীর।'

আমরা এর পর একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। ভ্যাপসা একটা গন্ধ নাকে আসছিলো। অনেক সিঁড়ি। নেলী খালা বললেন, 'তোমরা তাহলে গুপ্তধন খুঁজতে এখানে এসেছিলে ?'

বাবু বললো, 'প্রথমে গুপ্তধন খোঁজার প্ল্যান ছিলো। পরে লরেল হার্ডির আলোর সংকেত দেখে অন্য কিছু ভেবেছিলাম। তদন্ত করতে গিয়েই এতো কিছু।'

টুনি বললো, 'ওই পাজি দুটোকে লরেল হার্ডি বলো না। লরেল হার্ডি অনেক ভালো। গোবরটা কী শয়তান! তোমাদের ঘরে না দেখে আমরা ওকে শেকল আটকে রেখে এসেছিলাম। দিব্যি বেরিয়ে এসেছে।'

বাবু টুনিকে বললো, 'তোমরা স্ক্যাটরাকে না আনলে এতোক্ষণে আমাদের প্রাণ-পাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যেতো।'

টুনি বললো, 'ছিঃ, কী নোংরা কথা !'

নেলী খালা বললেন, 'আমার বাপু মাথায় কিছু ঢুকছে না। ললি টুনি কি তোমাদের সঙ্গে আসে নি ?'

টুনি বললো, 'দেখ না নেলী খালা। আমাদের না বলে দিব্যি এ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছেন। আমাকে আর ললিপাকে না বলে আসার মজাটা টের পেয়েছো তো ?'

আমি বললাম, 'মজা আর বলতে ! এখনো মাথায় দুটো সুপুরি টনটন করছে।'

বাবু ফিক করে হেসে বললো, 'আমার একটা।'

আমি বললাম, 'তাই বলে তোমার মতো আমার কপাল ফাটে নি।'

অবশেষে আমরা বাইরে এলাম। অবাক হয়ে চারপাশে তাকালাম। এ যে দেখি সেই ছাতিম গাছ আর আন্নাকালীর মন্দির ! মন্দিরের প্রতিমা রাখার বেদিটার নিচে যে এরকম একটা সুড়ঙ্গ আছে, আমরা কেউ ভাবতেও পারি নি।

অল্প দূরে নেলী খালার জীপটা দাঁড়িয়ে ছিলো। ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট দিতে দিতে নেলী খালা বললেন, 'এখনো আমার মাথায় ঢুকছে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি শানুপাকে স্বপ্নে দেখছিলাম। আচারগুলো রোদে দিচ্ছি না বলে তিনি আমাকে বকছিলেন। তখনই বাইরে দরজা খোলার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে দেখি ফতে গোবর্ধন কেউ ঘরে নেই। ওপরে গিয়ে দেখি তোমরা চার মূর্তি নেই। স্ক্যাটরাকে ডাকলাম। ওটাও নেই। আব্বুকে শুধু বললাম, 'আমি জাহেদের কাছে যাচ্ছি। আবির, বাবু, ললি, টুনিকে বোধ হয় ফতে গোবরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।'

জাহেদ মামার বাংলোর সামনে বনমালী দাড়িয়ে ছিলো। বাবু বললো, 'নেলী খালা, জাহেদ মামার ফ্রীজ থেকে একটু বরফ নিন।'

টুনি বললো, 'বরফ কী করবে, খাবে ?'

বাবু বললো, 'অতো সখ নেই, মাথার সুপুরিগুলোর জন্যে।'

নেলী খালা জীপ থামাতেই বনমালী ছুটে এলো। বললো, 'সবকিছু ঠিক আছে তো বিবিজি ?'

নেলী খালা এতোক্ষণে হাসলেন — 'সব ঠিক আছে। তুমি আমাদের একটু বরফ এনে দাও।'

বনমালী ছুটে গিয়ে ফ্লাস্কে করে বরফ এনে দিলো। নেলী খালা বললেন, 'জাহেদের ফিরতে একটু দেরি হবে। আর কোনো ভয় নেই বনমালী।'

বনমালী সবগুলো দাঁত বের করে বললো, 'কী যে বলেন বিবিজি ! বনমালী ভয় পাবার বান্দা নয়।'

গাড়িতে যেতে যেতে বাবু নেলী খালার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো। অনেক রাত হয়েছে। পাহাড়ের ওপর কালো আকাশে শুধু তারার মিছিল। গুহার ভেতরের গুমোট বাতাসের রেশটুকু চলে গেলো। ললিকে আস্তে আস্তে বললাম, 'বুকের ব্যথাটা এখনো আছে ললি ?'

ললি মাথা নেড়ে বললো, 'এখন নেই।'

ঘরে নানু আমাদের জন্যে স্টাডিতে পায়চারি করছিলেন, আমাদের দেখে তিনি রীতিমতো অবাক হলেন। নেলী খালাকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন— 'আমার চার কাপ চা খাওয়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘুম নষ্ট না করে ছাড়বে না দেখছি !'

নানুকে বললাম, 'আজ আর ঘুম হবে না। বসুন, আপনাকে সব খুলে বলছি। জাহেদ মামা এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

নানু বললেন, 'কোনো মারামারি হয় নি তো ? বাবুর কপাল কাটলো কী করে ?'

বাবু বললো, 'অনেক কিছু হতে পারতো। তবে সে রকম কিছুই হয় নি।'

নেলী খালা ফ্লাস্ক থেকে আমাদের বরফ বের করে দিলেন। মাথার সুপুরিতে বরফ ঘষতে ঘষতে নানুকে সব খুলে বললাম। ততোক্ষণে জাহেদ মামাও এসে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন। কিছু কিছু জেরাও করলেন— 'পাকড়াশীকে তোমরা সন্দেহ করলে কীভাবে?'

আমি বললাম, 'প্রথমে ওর পাহাড়ে আলো আর সেই অদ্ভুত লম্বা মানুষ দেখে, তারপর ফতে গোবরকে ওর বাসায় যেতে দেখে। ফতেরা যদিও অস্বীকার করেছিলো, পরে আমরা

লুকিয়ে ফলো করে টের পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে পাকড়াশীর যে সম্পর্ক আছে— সেটা ওরা গোপন রাখতে চায়।' ভাইয়া যে বলেছিলো পাকড়াশীটা খুব পাজি, সে কথা আর জাহেদ মামাকে বললাম না। ভাইয়ার কথা কাউকেই বলবো না।

টুনি বললো, 'আবির যে লম্বা মানুষ দেখেছিলো, ওকে ধরেছো জাহেদ মামা ?'

জাহেদ মামা হেসে বললেন, 'মানুষটা লম্বা নয়। রণ-পা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়। লোকজনকে ভয় দেখানোও হয়, আবার তাড়াতাড়ি চলাফেরাও যায়। এবার বলো, ফতে গোবরকে প্রথম কী দেখে সন্দেহ করলে ?'

আমি বললাম, 'সেই যে খাবার টেবিলে গোবর স্ক্যাটরাকে দেখে ভয় পেলো, তখন ফতে বিড়বিড় করে বলেছিলো, এসব কাজে ওস্তাদ কেন যে এমন ভীতুর ডিমগুলোকে সঙ্গে দেয় বুঝি না।— তাতেই প্রথম সন্দেহ হলো। তারপর হাঁপানির রোগী বলে দোতালায় থাকলো না, অথচ তরতর করে পাহাড় বেয়ে উঠলো। এ ছাড়া মেঝেতে কান পেতে ওদের কথা শুনেছিলাম। শেষে মেঝে ফুটো করে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে ফেললাম।'

জাহেদ মামা বললেন, 'ওরা যে পাহাড়ে পাহাড়ে কী রকম শেয়ালের মতো সুড়ঙ্গ কেটে রেখেছিলো, বাইরে থেকে বোঝার এতোটুকু সাধ্যি নেই। আমরা পাঁচটা মুখ খুঁজে পেয়েছি। আরও খোঁজা হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'সেই সব সুড়ঙ্গের মুখে নিশ্চয়ই একটা গাছ আছে, যেখানে মড়ার খুলি আঁকা রয়েছে?'

জাহেদ মামা হেসে মাথা নাড়লেন। নেলী খালা শুধু অবাক হচ্ছিলেন।

জাহেদ মামা এরপর নেলী খালাকে বললেন, 'তোমার স্ক্যাটরা যে কী উপকার করেছে নেলী। ওকে একটা মেডেল দেয়া দরকার। ও ভেতর থেকে না চ্যাঁচালে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, মাটির নিচে এতো কিছু ঘটছে। আসলে ওর চ্যাঁচানি শুনেই পাকড়াশীর লোকগুলো ঘাবড়ে গিয়েছিলো। নইলে হাজার পেটালেও ওরা স্বীকার করতো না।'

আমি বললাম, 'স্ক্যাটরা না এলে এতোক্ষণ আমরা জাহাজে থাকতাম। তবে বাথিন যে ওদের দলের, এটা আমরা আগে কখনো ভাবি নি।'

স্ক্যাটরা যেই শুনলো ওকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তক্ষুনি ছুটে এসে ময়লা পা নিয়ে জাহেদ মামার কোলে উঠে বসলো।

নেলী খালা গরম পানি এনে বাবুর কপালে আর স্ক্যাটরার মাথায় ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন।

সেই রাতে আমাদের কথা যেন আর ফুরোতেই চায় না। নেলী খালা বললেন, 'আমি শুধু ভাবছি শানুপা শুনলে কী করবেন।'

আমি হেসে বললাম, 'কী আর করবেন। বুঝবেন উদভুট্টি কাণ্ড করার ব্যাপারটা শুধু একচেটিয়া তোমার নয়। আমরাও উদভুট্টি কাণ্ড করতে পারি।'

নানু হেসে বললেন, 'শানু আর জামানকে আসতে লিখে দাও। সাত দিনের ছুটি পেতে জামানের নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।'

জাহেদ মামা একটু লাজুক হেসে বললেন, 'আমিও লম্বা একটা ছুটির দরখাস্ত দেবো ভাবছি।'

টুনি বললো, 'তারপর আমরা সবাই মিলে সত্যিকারের সোনার খনি আর হার্মাদদের গুপ্তধন খুঁজবো।'

ললি বললো, 'পিকনিকের কথা বাদ দিচ্ছো কেন ? আমরা রোজ পিকনিক করবো।

মা এলে যে কী দারুণ মজা হবে, আমি ভাবতেই পারছিলাম না। এমনও তো হতে পারে যে, ভাইয়ার সঙ্গে মার দেখা হয়ে গেলো। নির্ঘাত আনন্দে ফিট হয়ে যাবেন। আর ভাইয়া যখন সব শুনবে, তখনও কি ভাববে আমি ছোট্টটি রয়ে গেছি, যাকে সব কথা বলা

যায় না ? সে-রাতে আমাদের কারোই ঘুম এলো না। বাইরে যখন কাক ডাকলো, তখন নেলী খালা আমাদের চার জনকে চার গ্লাস দুধ এনে দিলেন। দুধ খাওয়ার পর আধখানা ভেলিয়াম টু দিয়ে বললেন, 'এটা খেয়ে এক্ষুনি ঘুমুতে যাও। সন্ধেয় জাহেদের ওখানে বিরাট এক পার্টি আছে।'

পার্টিতে আরও চমক

পরদিন সকালে এগারোটায় আমাদের ঘুম ভাঙলো। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম ফুলোটা অনেক কমেছে। আমি যখন উঠে বসেছি, তখনো বাবু ঘুমিয়ে ছিলো। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ করা। ভারি মায়া লাগলো ওকে দেখে। আস্তে আস্তে ওকে ডেকে তুললাম। ঘুমঘুম চোখে বাবু আমার দিকে তাকালো। নেলী খালা জানালার ভারি পর্দাগুলো সব টেনে দিয়েছেন বলে ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার ছিলো। বাবু বললো, 'আজকের প্রোগ্রাম বলো।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'কেন জাহেদ মামার পার্টি !'

ললি টুনি দেখলাম আমাদের আগেই উঠে পড়েছে। টুনি ফুলো মুখে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বললো, 'হিরোদের দেখি ঘুম ভেঙেছে। নিচে গিয়ে দেখো যে জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে সোনার খনি খোঁজার জন্যে দু'জন বুড়ো ভদ্রমহিলা এসেছেন। নেলী খালা ওদের বোঝাচ্ছেন আসল হিরো হলে তোমরাই।'

আমি বললাম, 'জাহেদ মামা কি নকল হিরো ?'

বাবু ললি টুনি একসঙ্গে হেসে ফেললো। আমি আর বাবু মুখ-হাত ধুয়ে ললি টুনিকে নিয়ে নিচে এলাম।

নেলী খালা জিওলজিক্যাল সার্ভের বুড়ো ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আমাদের এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, আমর দু'জন পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলাম।

খাবার টেবিলে বসে টুনি আমার কানে কানে বললো, 'ভদ্রমহিলারা তোমাদের দু'জনকে পছন্দ করে ফেলেছেন। কথাটা বোধহয় এবার পাকা করেই যাবেন। নইলে নেলী খালা, শানু খালাকে চিঠি দেয়ার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না।'

আমার মুখের ভেতর আস্ত একটা ডিম; তাই কোনো কথা বলতে পারলাম না। মারার জন্যে হাত তুললাম। টুনি একছুটে পালিয়ে গেলো। বাবু অবাক হয়ে বললো, 'কী বলেছে টুনি ?'

টুনির কথা শুনে বাবু আর ললি হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সন্ধেবেলা আমরা সবাই সেজেগুজে জাহেদ মামার বাংলোতে এলাম। নেলী খালা চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী নীলের ভেতর ছাই রঙের নকশা-আঁকা সিল্কের শাড়ি পরেছেন। আমি

পরেছিলাম, বাবু যে শার্টটা আমার জন্যে আমেরিকা থেকে এনেছিলো। বাবুকেই সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগছিলো। বেচারার মাথার ব্যান্ডেজটা নেলী খালা খুলতে দেন নি। ললি টুনি রাশান মাক্রুশকা পুতুলের মতো সেজেছিলো। টুনির চুলগুলো অবশ্য আগের মতোই ঝোলানো শিং-এর মতো খোঁপা করা ছিলো। ললি জামার সঙ্গে রং মিলিয়ে চওড়া রিবন দিয়ে ওর রেশমের মতো নরোম আর চকচকে চুলগুলো বেণী বেঁধেছিলো। নানু পরেছেন হালকা ছাই নীল রঙের সামার স্যুট। স্ক্যাটরা বেচারাও বাবুর মতো ব্যান্ডেজ খুলতে পারে নি। ললি ওর গলায় একটা লাল রিবন বেঁধে দিয়েছে।

জাহেদ মামা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। গাঢ় নীল প্যান্টের সঙ্গে হালকা নীল শার্টে জাহেদ মামাকে ঠিক বিদেশী ছবির নায়কদের মতো দেখাচ্ছিলো। ওঁর পাশে পুরো ইউনিফর্ম পরা একজন আর্মি কর্নেল। জাহেদ মামা হেসে আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা সেই ক্ষুদে গোয়েন্দার দল।'

কর্নেলের সঙ্গে আমরা হাত মেলালাম। তিনি বললেন, 'ইউ লিটল ডেভিলস। তোমাদের সত্যিই তুলনা হয় না !'

সেদিন সন্ধ্যায় জাহেদ মামার বাগানে একটা দারুণ পার্টি হলো। বাগানে ছোট ছোট টেবিল-চেয়ার পেতে রীতিমতো জমকালো আয়োজন করা হয়েছে। অতিথিরা আসার পর সবাইকে প্রথম লেবুর ঠাণ্ডা শরবৎ দেয়া হলো। শরবৎ খেতে খেতে জাহেদ মামা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। পাকড়াশী যে কতো দুর্ধর্ষ এক স্মাগলার, কীভাবে তারা সকলের অগোচরে সোনা পাচার আর জাল টাকার কারবার করতো, আমরা কীভাবে সে-সব খুঁজে বের করলাম— শুনে গেস্টদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। কক্সবাজার থেকে কয়েক জন সাংবাদিক এসেছেন। তাঁরা ঘনঘন ছবি তুললেন। ছবি থেকে আমরা চার জনও বাদ পড়লাম না। টুনি এক জন বুড়ো সাংবাদিককে বললো, 'আমাদের ছবি আপনারা খবরের কাগজে ছাপবেন ?'

মিষ্টি হেসে সাংবাদিক ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই, দেখবে প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়ে গেছে— যেখানে মন্ত্রী-টন্ত্রীদের ছবি ছাপা হয়।'

বুড়ো সাংবাদিকের গলার স্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই মনে হলো চশমার ভেতর দিয়ে বুঝি আমাকে চোখ টিপলেন।

বাবু আরেক জন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলো। বুড়ো বললেন, 'চলো তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবো।'

ললি টুনি তখন বাবুর কথা শুনছিলো। বুড়ো সাংবাদিকের সঙ্গে আমি জাহেদ মামার ড্রয়িংরুমে এলাম। মুখ টিপে হেসে চশমাটা খুলে বুড়ো বললেন, 'কি রে, চিনতে পারিস নি তো।'

আমি হাসলাম— 'চেহারা যতোই লুকোও না কেন ভাইয়া, তোমার গলা শুনে আমি ঠিক ধরে ফেলেছিলাম।'

ভাইয়া হাঁপ ছেড়ে বললো, 'যাক বাঁচা গেলো, নেলী খালাও চেহারা দেখে চিনতে পারে নি। গলা তো আর সবাই চেনে না। তবে যাই বলিস, তোরা যে কাজ করেছিস, এর কোনো তুলনা হয় না।'

আমি লজ্জা পেলাম— 'তুমি যখন বললে পাকড়াশী তোমাদেরও কাজের ক্ষতি করেছে, তখন আমার জিদ চেপে গিয়েছিলো।'

ভাইয়া মৃদু হেসে আমার হাত তার হাতের মুঠোয় পুরে বললো, 'তোকে নিয়ে আমার ভয় ছিলো। এতোদিনে নিশ্চিন্ত হলাম। চল এবার ওদিকে যাই। বেশি দেরি হলে সন্দ করবে।'

বাগানে এসে দেখি কক্সবাজার থেকে বুড়ো মুৎসুদ্দিও এসেছেন। কী আশ্চর্য ! তিনি নাকি গোয়েন্দা বিভাগের একজন জাঁদরেল অফিসার। এদের ধরার জন্যে ছদ্মবেশে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কানে কম শোনার ব্যাপারটা পুরোপুরি অভিনয় ছিলো। বললেন, কানে তিনি আমাদের কারো চেয়ে কম শোনেন না। এই বলে আড়চোখে একবার নেলী খালার দিকে তাকালেন— 'মিস চৌধুরীর সরস মন্তব্যগুলো আমি খুব উপভোগ করতাম। তবে সব পক্ষের কথাবার্তা শোনার জন্যে আমার না শোনার ভানটা অনেক কাজে লেগেছে।'

নেলী খালা এতখানি জিব কেটে লাল-টাল হয়ে সে যে কী কাণ্ড ! আমরাও কম লজ্জা পাই নি। বাবু তো ওঁকে চিল্লানোরাস বলেছিলো। ফতে ওঁর কথা শুনে কী মন্তব্য করেছিলো সেটাও বললাম। তিনি হেসে বললেন, 'আমিও জাল প্রায় গুটিয়ে এনেছিলাম। তবে সব কটাকে একসঙ্গে ধরা আমার কম্মো ছিলো না।'

তারপর নানু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আসছে শীতের কোনো এক সময়ে মেজর জাহেদ আহমেদের সঙ্গে আমার মেয়ে নেলীর বিয়ে হবে।'

সবাই হাত তালিতে ভেঙে পড়লো। নেলী খালা লাল হলেন। জাহেদ মামা লাজুক হাসলেন। আমরা চার জন অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালাম। তারপর দ্বিগুণ জোরে হাততালি দিলাম।

মুৎসুদ্দি সায়েব নেলী খালাকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করলেন। মুৎসুদ্দি আর বলি কেন, ওটা তো ছদ্মনাম। ওঁর আসল নাম হলো তানভীর হোসেন চৌধুরী। নেলী খালা একটু আপত্তি করে, খালি গলায় পর পর অনেকগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। নেলী খালা যে এতো সুন্দর গাইতে পারেন, আগে কখনো আমরা টের পাই নি।

অনুষ্ঠানের শেষে এক বিশাল ভোজ। শুধু খেতে খেতেই ঝাড়া একটি ঘণ্টা লেগে গেলো। খোলা লনে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিলো। অল্প সময়ে জাহেদ মামা সব কিছু এতো সুন্দর করে আয়োজন করেছেন যে, সবাই খুব প্রশংসা করছিলো।

খাবার পর অতিথিরা একে একে নেলী খালা আর জাহেদ মামাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। সাংবাদিকরা সবাই জাহেদ মামার জীপে করে এসেছিলেন। ভাইয়াও ওদের সঙ্গে চলে গেলো। যাওয়ার সময় ভাইয়া আমাদের সবাইকে আবার অভিনন্দন জানালো। নেলী খালাকে বললো, 'মিস চৌধুরী, শুভ কাজের নেমন্তন্ন পাঠাতে ভুলে যাবেন না।' নেলী খালা লজ্জায় লাল হলেন। ওঁরা চলে যাবার পর শুধু রইলেন কর্নেল আর বুড়ো মুৎসুদ্দি, থুড়ি তানভীর সায়েব। এঁরা দু'জন আলাদা গাড়ি নিয়ে এসেছেন। নানু, জাহেদ মামা আর নেলী খালা বারান্দায় বসে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

আমরা লনে একটা দেবদারু গাছের পাশে বসে ছিলাম। সমুদ্রের উদ্দাম বাতাসে বারান্দার লতা-গোলাপের ঝাড় থেকে এলোমেলো পাপড়ি খসে পড়ছিলো। দূরে ঝাউবনে শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছিলো। বাবু আর টুনি অল্প দূরে বসে কী একটা কথা বলে হাসাহাসি করছিলো। আমি ভাবছিলাম নেলী খালা আর জাহেদ মামার কথা। নেলী খালা কী সুন্দরভাবে এক জন আর্মি মেজরকে ভাইয়াদের দলে নিয়ে এলেন।

আমার পাশে ললি বসেছিলো। গোলাপের দুটো পাপড়ি ওর মাথায় এসে পড়েছে। পাপড়িগুলো আলতোভাবে তুলে ললিকে বললাম, 'এতো চুপচাপ কেন ললি ! কথা বলো !'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'আমার কাছে সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।'

স্ক্যাটরা আমাদের পাশে শুয়েছিলো। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলাম। বললাম, 'আমি এই কটা দিনের কথা চিরদিন মনে রাখবো।' একটু থেমে আবার বললাম, 'বাড়ি ফিরে গেলে একা-একা আমার খুব খারাপ লাগবে। তুমি আমাকে চিঠি লিখবে ললি?'

আমার পিঠে আলতোভাবে একটা হাত রেখে ললি আস্তে আস্তে বললো, 'লিখবো। আমাকে তোমার খুব কাছের এক জন বন্ধু ভাববে।'

আমি বললাম, 'আমি তোমার মতো একজন বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলাম।'

ললি মৃদু হাসলো। কোনো কথা বললো না। ওকে খুব পবিত্র, নরোম আর সুন্দর মনে হচ্ছিলো।

রাত আরো গভীর হলো। টুনি আর বাবু ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। আমরা দু'জন চুপচাপ বসে সমুদ্রের গর্জন শুনছি। উতলা বাতাসে তখনো গোলাপের পাপড়িগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

* * * * * * *